প্রথম আলো বিজয় দিবস সংখ্যা ২০১৫

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বীজ ও বিষবৃক্ষ

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রাক্কালে, পাকিস্তানি বাহিনী ও তার দোসরদের চূড়ান্ত পরাভব স্বীকারের আগমুহূর্তে, বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের ঠান্ডা মাথায় যে নৃশংসতার সঙ্গে হত্যা করা হয় এবং হত্যার পর ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত শবদেহগুলো বুড়িগঙ্গা নদীতীরের পরিত্যক্ত ইটের ভাটায় গাদাগাদি করে ফেলে রাখা হয়, সেই নিষ্ঠুরতার পেছনে মতাদর্শের ভূমিকা ও স্বরূপ যে এখনো আমরা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পেরেছি, তা বলা যাবে না। পরতে পরতে উন্মোচিত হয়েছে এই হত্যাকাণ্ডের বাস্তবতা এবং সেই উন্মোচন এখনো এত বছর পরও রয়েছে অব্যাহত। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ যে বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে ঘর থেকে তুলে নিয়ে একত্রে হত্যা করা হয়েছে, সেটা তো জানা গেল বিজয় অর্জনের পর। তিন দিন খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকা ক্ষত-বিক্ষত অনেক লাশ শনাক্ত করা যায়নি। অনেকের লাশের কোনো সন্ধান আর মেলেনি, হয়তো খুবলে খেয়েছে শকুন কিংবা কুকুর, কিংবা ফেলা হয়েছে আর কোনো গর্তে, যা আর কেউ কখনো খুঁজে পায়নি।

দেশব্যাপী পরিচালিত নয় মাসের গণহত্যায় অগণিত মানুষের প্রাণদানের সীমাহীন ট্র্যাজেডিতে ভয়াবহ মাত্রা যোগ করেছিল বুদ্ধিজীবী হত্যা, যার কোনো সামরিক কার্যকারণ ছিল না, তবে বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে প্রবল আক্রোশ যে এখানে ফুটে উঠেছে, সেটা বুঝতে ভুল হওয়ার অবকাশ ছিল না। অচিরেই জানা গেল দুই ঘাতকের পরিচয়—চৌধুরী মঈনুদ্দিন ও আশরাফুজ্জামান খান এবং হন্তারক সংগঠন, ইসলামী ছাত্রসংঘের পরীক্ষিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত আলবদর বাহিনী-সম্পর্কিত কিছু তথ্য। গভর্নর হাউসে প্রশাসনের প্রধান মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর ডেস্ক ডায়েরিতে পাওয়া গেল অনেক বুদ্ধিজীবীর নাম, কারও নামের পাশে আছে ক্রসচিহ্ন, কোথাও বা লেখা বাড়ির নম্বর, অথবা কোনো মন্তব্য। নোটশিটের এক জায়গায় লেখা ছিল, ক্যাপ্টেন তাহির ব্যবস্থা করবে আলবদরদের গাড়ির। বুঝতে পারা যায়, সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক শক্তির যোগসাজশ, কিন্তু এর পেছনের দর্শন ও তথাকথিত ধর্মাদর্শ বিচার-বিশ্লেষণ অনেকটা থেকে যায় আড়ালে।

ঘটনার পরম্পরা উদঘাটিত হয়েছে পরতে পরতে, এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানি ঘাতকপ্রধানের কাছ থেকে পাওয়া গেছে তথ্য, আর ঘাতক দলের পক্ষ থেকেও পাওয়া গেছে গুপ্তবাহিনী গঠনের বিবরণী। উভয় ক্ষেত্রেই নিজেদের সাফাই গাওয়া এবং অহং প্রকাশের তাগিদ ছিল মুখ্য, কিন্তু সত্য তো অলক্ষেই তার কাজ করে চলে। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী লিখেছেন তাঁর স্মৃতিকথা, লাহোরের জং পাবলিশার্স প্রকাশ করেছে ১৯৯২ সালে, সেখানে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অদ্ভুত সাফাই তিনি গেয়েছেন, লিখেছেন, ‘আমার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিল যে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাতে ২০০ বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যবস্থা আমি করেছি। আগের সন্ধ্যায় ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারতীয়রা ঢাকা শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়। সত্য ঘটনা হচ্ছে, ১৭ ডিসেম্বর সকালে অনেক মৃতদেহ পাওয়া যায়। এর আগে ১৬ ডিসেম্বর

পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে, তাই এই হত্যাকাণ্ড নিশ্চয় তারা ছাড়া অন্য কেউ করেছে।'
বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ১৪ ডিসেম্বর, বধ্যভূমি থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষ এর সরব সাক্ষী, আর গলাপচা শবদেহগুলো সাক্ষ্য দিয়েছে নীরবে। রাও ফরমান আলীর পক্ষে তাই ১৬ ডিসেম্বর রাতে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ঘটার আষাঢ়ে গপ্প ফাঁদতে হয়, তবে গল্পকথার ফাঁকেও সত্য প্রকাশিত হয় অজান্তে। কাদালেপা মাইক্রোবাসে করে যে বুদ্ধিজীবীদের তুলে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাঁদের বাড়ি থেকে, সেটা তো বিভিন্নভাবে জানা গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রাও ফরমান আলী বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের পেছনের এক ঘটনা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলেছেন, অবশ্যই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য। তিনি লিখেছেন, '১০ ডিসেম্বর সূর্যাস্তের সময় ঢাকার কমান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ আমাকে পিলখানায় তাঁর দপ্তরে আসতে বলেন। তাঁর কম্যান্ড পোস্টের কাছাকাছি এসে আমি অনেকগুলো গাড়ি দেখতে পাই। বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে এসে তিনি আমাকে গাড়িতে উঠতে বলেন, কয়েক মিনিট পর আমি জানতে চাই, এই গাড়িগুলো কেন আনা হয়েছে? তিনি বললেন, ''নিয়াজির সঙ্গে সেটা নিয়েই কথা বলতে চাই।'' ক্যান্টনমেন্টের হেডকোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে তিনি জানালেন, বিপুলসংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও অগ্রণী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করার আদেশ তিনি পেয়েছেন। আমি তাঁকে বলি, কেন, কী কারণে? গ্রেপ্তার করার সময় তো এটা নয়।'
এই বয়ান স্পষ্টত বুঝিয়ে দেয় বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিহ্ন করার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল, তালিকা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করার জন্য গাড়িও ছিল প্রস্তুত। তালিকা নিয়ে গাড়ির সওয়ারি হয়ে বাড়ি বাড়ি যারা যাবে, সেই বাঙালি ঘাতকেরাও ছিল তৈরি। এই ঘাতকদের দেখেছেন শহীদ পরিবারের সদস্যরা, মুখ কাপড় দিয়ে আবৃত ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, তবে কারও কারও মুখের কাপড় সরে গিয়েছিল, পরে ছবি দেখে তাদের শনাক্ত করা যায় এবং এভাবে ঘটনার পরম্পরা হয়েছিল যুক্ত ও উন্মোচিত। ১০ ডিসেম্বর যে প্রশান্ত সন্ধ্যায় পিলখানায় প্রবেশের বিবরণ দিয়েছেন ফরমান আলী, সেখানে সেই দিনটির নাটকীয়তার কোনো উল্লেখ নেই, অথচ এই দিন সকালেই লড়াইয়ে হার মেনে গভর্নর হাউস থেকে জাতিসংঘ প্রতিনিধির কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন ফরমান আলী স্বয়ং। যুদ্ধবিরতির সেই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি, দাবি ছিল নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের। এরপর সংকট আরও ঘনীভূত হয় এবং ১৩ ডিসেম্বর জেনারেল গুল হাসান রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রেরিত বার্তায় ইঙ্গিত দেন, পীতজাতি আসবে উত্তর থেকে, আর দক্ষিণ থেকে আসবে শ্বেতাঙ্গ। অর্থাৎ চীন ভারত সীমান্ত আক্রমণ করবে এবং বঙ্গোপসাগর দিয়ে ধেয়ে আসবে মার্কিন সপ্তম নৌবহর। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিয়াজিকে আত্মসমর্পণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বিলম্বিত হয় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ। বাড়তি সময়টুকুতে ঘটে বাড়তি ও ভয়ংকর নৃশংসতা—বুদ্ধিজীবী হত্যা।
বুদ্ধিজীবী নিধন পরিকল্পনা যারা বাস্তবায়ন করেছিল, সেই ঘাতক আলবদর কখনো তাদের অপরাধ স্বীকার করেনি, কিন্তু আলবদর বাহিনী গঠনের সবিস্তার বিবরণী তারা দাখিল করেছে তাদেরই প্রণীত গ্রন্থে। সেলিম মনসুর খালিদ প্রণীত উর্দু গ্রন্থ আলবদর প্রকাশিত হয়েছিল লাহোর থেকে জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলে, ১৯৮৫ সালে। এই বইয়ে আলবদরপ্রধান, তাঁদের সহকারী ও অন্য সদস্যদের বিভিন্ন ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে ইসলামের স্বঘোষিত রক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, তবে সবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ছদ্মনাম। তারপরও সবচেয়ে বড় যে স্বীকৃতি ফুটে উঠেছে তা হলো, সেনাবাহিনীর বিধিবদ্ধ কাঠামোর বাইরে জঙ্গি ও হিংসাশ্রয়ী ইসলামের অনুসারী রাজনৈতিক দলের তরুণ ক্যাডারদের সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও অর্থ দ্বারা সমর্থিত ও পরিচালিত গোষ্ঠীতে রূপান্তর। এই গোষ্ঠী যে হবে ঘাতক গোষ্ঠী, তাদের কার্যকলাপ যে হবে 'ইসলামের শত্রুকে উৎখাত' করা, সেটা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বুদ্ধিজীবী হত্যায় আলবদর নেতা আলী আহসান মুজাহিদ, মতিউর রহমান নিজামী, মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, চৌধুরী মঈনুদ্দিন, আশরাফুজ্জামান খান ও কাদের মোল্লার ভূমিকা বারবার উঠে এসেছে এবং এই বই সেখানে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তবে এসব হচ্ছে ঘটনার পরম্পরা, এর পেছনে যে মতাদর্শ, যা

ধর্মের মহৎ আদর্শ অবলম্বন করে ঘৃণার বিষভাণ্ড তৈরি করে এবং পূর্ণ করে তোলে কানায় কানায়, সেসব তো দাবি করে আরও গভীর বিবেচনা। এই বিশ্লেষণ আমাদের বুঝতে সহায়তা করবে কীভাবে রোপিত হয় ঘৃণার বীজ এবং তা ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে বিষবৃক্ষ, হয়ে ওঠে সমাজের ব্যাপক মানুষের জীবন-সংহারক। এর সূচনা আপাতদৃষ্টিতে অহিংস সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ঘিরে, কিন্তু সেখানে অসহিষ্ণুতা ও হিংসার উপাদান যেমন নিহিত থাকে, তেমনি দেখা যায় অন্যকে চিহ্নিত করার প্রবণতা, রাষ্ট্রের সমাজের ধর্মের শত্রু হিসেবে গণ্য করা।

এমনই সংঘাতের বীজ রোপণ করেছিল পাকিস্তানি দ্বি-জাতিতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক আদর্শ এবং প্রকাশ পেয়েছিল সর্বজনীন রাষ্ট্রকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপদানের প্রচেষ্টায়। তথাকথিত ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার পরিপোষক পাকিস্তান ছিল এক বায়বীয় ধারণা, কেননা ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়, যা ব্যক্তিকে গোষ্ঠীবদ্ধ করে, কোনো জাতিসত্তায় রূপায়িত করে না। একই ধর্মের মানুষ নানা ভাষা-সংস্কৃতির অনুসারী হতে পারে, হওয়াটাই সংগত। কিন্তু এর বিপরীতে পাকিস্তানি জাতিসত্তা তথা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা মুছে ফেলতে চাইছিল ভাষা-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক সত্তা। দ্বন্দ্বের এমনই প্রকাশ আমরা দেখি ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে যখন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, ‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকার জো টি নেই।’

সভায় উপস্থিত অবাঙালি শিক্ষাসচিব ফজলে আহমেদ সব শিষ্টাচার ভঙ্গ করে সভাপতির ভাষণের পর মঞ্চে তেড়ে উঠে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি বলেন, ‘আজ এখানে যেসব প্রবন্ধ পড়া হলো, সেগুলো শোনার পর আমি ভাবছি, আমি কি ঢাকায় আছি না কলকাতায়।’

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে বাঙালি জাতিসত্তার ওপর চাপিয়ে দিতে হবে ‘মুসলিম জাতিসত্তা’, আর সে ক্ষেত্রে বাংলার সম্প্রীতির সমাজবন্ধন বিনষ্ট করতে হবে এবং বাঙালি সংস্কৃতির বিলুপ্তি না হোক, অন্তত বিভ্রম সৃষ্টি করে জগাখিচুড়ি এক সংস্কৃতি বা সংস্কৃতিহীনতার জন্ম দিতে হবে। আর এই কাজ করার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হতে পারে ধর্ম। ১৯৪৮ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে জিন্নাহর সদম্ভ উক্তি ছিল এই পাকিস্তানি রাষ্ট্রনীতির প্রকাশ। ১৯৫০ সালের দাঙ্গা ও ব্যাপকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ ছিল এই নীতির প্রতিফল। বায়ান্নর একুশেতে বাংলা ভাষার জন্য তরুণের আত্মাহুতিতে জাতির জাগরণ সূচিত হলে মর্নিং নিউজ পত্রিকার শিরোনাম ‘ঢাকার রাজপথে ধুতির বিচরণ’ সেই বিকৃত চিন্তাজাত বিকৃত মানস মেলে ধরে, অন্য সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সঞ্চারের বর্বরতা আর চাপা থাকে না।

জাতিকে পদানত, বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার নানা আয়োজনে ভরপুর ছিল পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনকাল। ধর্ম হয়েছিল তাদের এই অভিযানের ঢাল ও তলোয়ার। সশস্ত্র এই দুই শক্তির ওপর মালিকানা থাকে রাষ্ট্রের, একাত্তরে চূড়ান্ত সমাধানের জন্য সশস্ত্র সব শক্তি নিয়ে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানি বাহিনী তথা পাকিস্তানি রাষ্ট্র। সেই পটভূমিকায় বাঙালির প্রতিরোধ মোকাবিলায় ঢাল হাতে নিল জঙ্গি ইসলামের প্রবক্তা রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী, তাদের তরুণ অনুসারীদের হাতে তুলে দিল তলোয়ার, সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সমর্থন ও মদদে।

এই সংযোগ যে বিষময়তা ও সশস্ত্রতার জন্ম দিয়েছিল, তারই নিষ্ঠুর ছোবলে মৃত্যুবরণ করতে হয় বাংলার বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের। এর পেছনের জঙ্গি মতাদর্শ ও সংগঠন বুঝে-ওঠা তাই বহন করে অশেষ গুরুত্ব। গণহত্যার বীজ যদি বেড়ে উঠতে দেওয়া হয়, তবে বিষবৃক্ষের শিকড়ের বিস্তার, কাণ্ডের শক্ত হয়ে ওঠা ও সমাজে ডালপালা মেলে দেওয়া রোধ সম্ভব হয় না। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বর্বরতার সামগ্রিক কাঠামো ও

মতাদর্শ পর্যালোচনা তাই বহন করে বিশেষ তাৎপর্য।
‘জেনোসাইডওয়াচ’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক গ্রেগরি স্ট্যানটন গণহত্যার আটটি ধাপ শনাক্ত করেছিলেন। এর শুরু সাদামাটাভাবে বিভাজন বা ক্লাসিফিকেশনের মাধ্যমে যখন কোনো গোষ্ঠীকে আলাদাভাবে ক্ষতিকারক বা শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে তা রূপ নেয় আদর্শগত সংহতি ও সংগঠনে, কেননা গণহত্যা কিংবা বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের মতো কাজ সম্পাদনে চাই মতাদর্শ দ্বারা অন্ধ ব্যক্তিদের দিয়ে গঠিত উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তি। সপ্তম ধাপে গণহত্যা রূপ নেয় বীভৎসতার, গ্রেগরি স্ট্যানটন এই ধাপকে চিহ্নিত করেছেন উৎসাদন বা এক্সটারমিনেশন হিসেবে। এরপরও সর্বশেষ আরেকটি ধাপ চিহ্নিত করেছেন এই বিশ্লেষক, চূড়ান্ত সেই ধাপ হচ্ছে ডিনাইয়াল বা অস্বীকৃতি। আমরা এই ধাপের পরিচয় পাই মেজর জেনারেল ফরমান আলীর ভাষ্যে, নিজামী কিংবা মুজাহিদের বক্তব্যে, যাঁরা অস্বীকার করতে চান গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ কিংবা বুদ্ধিজীবী নিধনের ঘটনা।
বুদ্ধিজীবী হত্যাবিষয়ক বিচার-বিবেচনা তাই ধর্ম-অবলম্বন করে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং সেই সংগঠন দ্বারা সাম্প্রদায়িক সহিংস প্রচারণার নিষ্ঠুর পরিণতি প্রকাশ করে। অতীত পর্যালোচনা থেকে আমরা বুঝি ধর্মকে ব্যবহার করে নৃশংসতার প্রতিরোধে সমাজের ঐক্য ও অঙ্গীকার এবং সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণে অবদান রচনার কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রয়োজন বিষবৃক্ষের বীজ উৎপাটন, জঙ্গি ইসলামের মোকাবিলার সেই কর্তব্য সর্বতোভাবে পালনে এগিয়ে যাওয়া হয়ে উঠেছে সময়ের দাবি।

মফিদুল হক: মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ও লেখক

৩০ লাখের আর্তনাদ

রাতের আঁধার ছিন্ন করে ভোরে যখন আলো ফুটতে থাকবে, আকাশ হয়ে উঠবে ধূসর নীলাভ, মাঠের বুকে প্রকাশিত হতে থাকবে সবুজ, তারপর যে লাল সূর্যটি দিগন্ত ঠেলে উঠবে, আজ বিজয় দিবসের ভোরে তার দিকে তাকিয়ে আমাদেরই সব গরিমায় তাকে আমরা বিশেষ করে দেখে উঠব স্বাধীন-সার্বভৌম বাঙালির রাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওই—আমার দেশমায়ের সবুজ আঁচলে টকটকে লাল উদিত সূর্যটি।

দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে সশস্ত্র যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জনের গৌরব একমাত্র এই বাঙালিরই। আমরা যে হাজার বছর অপেক্ষা করেছিলাম মুক্তির ও স্বাধীনতার, কত ব্যর্থ যুদ্ধ ও বিপ্লবের পর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রণোদনায় তাঁরই রণমন্ত্র জয় বাংলা কণ্ঠে ও চেতনায় ধারণ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম। ঐতিহাসিক সেই যুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের রং আমরা দেখে উঠি পতাকায়। নমিত হৃদয়ে তাঁদের আমরা অভিবাদন করি প্রত্যয়ের মুষ্টি তুলে বিজয় দিবসে।

কিন্তু আজ এই ২০১৫-এর বিজয় দিবসে ওই যে সূর্যটি উঠেছে, একাত্তরে আমাদের দেশে পাকিস্তানি বাহিনী যে গণহত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, আমাদের ৩০ লাখ মানুষকে যে তারা হত্যা করেছিল, তাদের প্রতিটি রক্তফোঁটা মেখেই আজ এই সূর্যটি বিশেষভাবে উঠেছে, আর তার সঙ্গে ভোরের ভৈরবী নয়, বাতাসে এখন আমি শুনতে পাচ্ছি হাহাকার—আমার ১০ লাখ মা, বোন ও মেয়েদের, যারা ধর্ষিত হয়েছে, যাদের কোল খালি হয়েছে, যারা নিষ্ঠুর বৈধব্যের কাফনতুল্য সাদায় আবৃত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর চোখ প্লাবিত হয়েছিল তাদেরই অশ্রুতে, যখন তিনি একাত্তরের বিজয়ের পরে স্বদেশে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে দাঁড়িয়েছিলেন। আজও আমাদের মনে পড়ে, আমরা ভুলিনি।

আমরা যে ভুলিনি, বঙ্গবন্ধু-কন্যা ও উত্তরাধিকারী শেখ হাসিনা যে ভোলেননি, তারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচার করার জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন। একাত্তরের সেই কালে পাকিস্তানি বাহিনীর দালাল কুলাঙ্গার যারা খুনি হয়ে উঠেছিল, তাদের আমরা যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারের আদালতে তুলে বিধিমতো শাস্তির বিধান করতে শুরু করেছি—ইতিমধ্যেই চারজনের ফাঁসি কার্যকর—আরও অনেকেই রয়েছে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায়, অচিরে তারাও পাবে দণ্ড, এতে একাত্তরের গণহত্যায় নিহত বিদেহী আত্মা শান্তি পাচ্ছে ও জাতি কলঙ্কমুক্ত হচ্ছে। অনেক দেরিতে হলেও বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করে এবং দণ্ড কার্যকর করে ইতিহাসের দায় আমরা শোধ করছি।

২০১৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর আজ। আজই আমরা ভোরের প্রথম সূর্যটিকে বিশেষভাবে ৩০ লাখ মানুষের রক্তরাঙা দেখে উঠছি কেন? কারণ, ওই ৩০ লাখের প্রতিটি রক্তফোঁটা আজ চিৎকার করছে। চিৎকার করছে, কেননা পাকিস্তানমাত্রই কয়েক সপ্তাহ আগে বলেছে—না, বাংলাদেশে তারা গণহত্যা চালায়নি, একাত্তরে বাংলার মাটিতে তাদের হাতে কোনো হত্যা হয়নি এবং যারা যুদ্ধাপরাধী প্রমাণিত হয়ে আদালতের রায়ে সর্বোচ্চ দণ্ড পেয়ে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেছে, তারা যুদ্ধাপরাধী নয়, ঘোর অন্যায় করে তাদের প্রাণ হরণ করা হয়েছে! পাকিস্তান সরকার সে দেশে আমাদের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এই কথা জানিয়েছে এবং বলেছে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত ওরা যুদ্ধাপরাধী নয়, ওরা নাকি বিরোধীদলীয় নেতা।

কী মিথ্যাচার! সত্যের কী জঘন্য অপলাপ! আমরা হতবাক হয়ে যাই দেখে যে কতখানি নির্লজ্জ ও উদ্ধত হলে রাষ্ট্রীয় আচার লঙ্ঘন করে একটি স্বাধীন দেশের বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতি পাকিস্তান সরকার এমন উচ্চারণ করতে পারে!

কিন্তু তারা বললেই সত্য অসত্য হয়ে যাবে না। তাদের মুখের মিথ্যাও সত্য বলে গৃহীত হবে না। সত্য যে সত্যই! তাই বাইরে তারা যা-ই বলুক, নিজের নিভৃতে বুকে হাত দিয়ে পাকিস্তানিরা বলতে পারবে না, তাদের হাতে বাংলার রক্ত নেই।

একাত্তরে পাকিস্তানিরা বাংলার বুকে যে গণহত্যা চালিয়েছিল, বিশ্বের ইতিহাসে বৃহত্তম এক গণহত্যা, তার প্রমাণ খুঁজতে আর কোথাও যেতে হবে না, তার প্রমাণ রয়েছে তাদেরই দেশে, তাদেরই হাতে।

একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করার পর—ভুলে যাব না যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর কাছে জার্মানি ও জাপানের আত্মসমর্পণের ২৬ বছর পর এই প্রথম কোনো দেশের বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল সেদিন—পরাজিত ওই পাকিস্তান সেদিন গঠন করেছিল হামুদুর রহমান কমিশন এবং সেই কমিশনে পাকিস্তানেরই ঊর্ধ্বতন-অধস্তন বহু অফিসার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন বাংলাদেশে তাঁদের পরিচালিত গণহত্যার দানবীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। শুধু তা-ই নয়, একাত্তরে বাংলাদেশে

কার্যরত তাদেরই মুখপাত্র সিদ্দিক সালেকের স্মৃতিকথাতেও রয়েছে এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। আরও রয়েছে বাংলাদেশে তখনকার মার্কিন কূটনীতিক আর্চার ব্লাডের পাঠানো একের পর এক বিবরণে, ওই গণহত্যার ঘটনা।
আজ যখন এই ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পাকিস্তান, তখন গণহত্যায় নিহত সেই ৩০ লাখ মানুষের আত্মা চিৎকার করে ওঠে, আমরা বধির হয়ে যাই অশান্ত তাদের চিৎকারে; আমাদের মর্মের ভেতরে ঘোর রব তুলে ওই তারা বলছে—এর উপযুক্ত জবাব দেওয়ার সময় এখন হয়েছে।
আমি অনেক ভেবেছি, আমি অনেক অশ্রু নিয়ে তাকিয়ে দেখছি ২০১৫-এর এই বিজয় দিবসে উদিত রক্তলাল সূর্যটিকে, ৩০ লাখ আত্মার শপথ আমি উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেয়েছি। আর সেটি বলার জন্যই আমার এ ছোট্ট লেখাটি।
এই মুহূর্তেই আমাদের কর্তব্য:
আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা।
এবং সে ট্রাইব্যুনালে একাত্তরের খুনি পাকিস্তানি জেনারেল ও অফিসারদের অনুপস্থিত ধরেও বিচার করা।
এবং অপরাধ প্রমাণিত করে দণ্ডদান করা।
ইতিহাসে এমন বিচার ও দণ্ডদানের নজির আছে অপরাধীদের সশরীরে উপস্থিত করা না গেলেও।
আজ এই বিজয় দিবসে আমি আমাদের সরকারের কাছে জোর থেকে আরও জোর আবেদন জানাচ্ছি, একাত্তরের খুনি পাকিস্তানিদের বিচারের জন্য এই ট্রাইব্যুনাল অবিলম্বে গঠন করা হোক। বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ আইনজীবী আমার একাধিক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে উত্তর পেয়েছি—এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা খুবই সম্ভব এবং পাকিস্তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের এটাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট জবাব।
সময় বয়ে চলে, সময় বয়ে যায়। সময় বয়ে গেলেই অপরাধের ঘটনা ধুয়ে যায় না—অপরাধ অপরাধই থেকে যায়, এমনকি হাজার বছর পার হয়ে গেলেও। আমার মনে পড়ে, প্রয়াত বিচারপতি কে এম সোবহান একবার ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির এক সভায় বলেছিলেন, জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করার ঘটনা দুই হাজার বছর আগে হলেও কেউ যদি অভিযোগ আনে, নিহত ও ঘাতক হাজার বছর আগে ধুলায় মিশে গেলেও আজ এত দিন পরেও তার বিচার অবশ্য অবশ্যই করা যাবে এবং দণ্ডও দেওয়া যাবে।
আর একাত্তর তো সেদিনের ঘটনা। ইতিহাসের চোখে একটা পলকমাত্র। অচিরেই ২০২১-এ আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের ৫০ বছর অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তীর বছরে পৌঁছাচ্ছি। যদি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে আমরা সেদিনের খুনি পাকিস্তানিদের ইন অ্যাবসেনশিয়া ট্রায়াল অর্থাৎ অনুপস্থিত সত্ত্বেও বিচার করতে পারি, অপরাধ প্রমাণ করে তাদের প্রাপ্য শাস্তি-দণ্ড দিতে পারি, সে দণ্ড দৃশ্যত কার্যকর করা না গেলেও সেটাই হবে বাংলাদেশের মানুষের জন্য স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপহার।

সৈয়দ শামসুল হক: কবি ও কথাসাহিত্যিক

পাকিস্তানি টাকার মতো আমিও বাতিল: নিয়াজি

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর ভারতীয় দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ভারত ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা ও লে. জেনারেল নিয়াজির সাক্ষাৎকারভিত্তিক দুটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই দুই প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে দুই অধিনায়কের তখনকার মানসিক অবস্থা

তেজগাঁও বিমানবন্দর (ঢাকা), ১৮ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে সাতটা। প্রায় ফাঁকা এয়ারপোর্ট। আজ এয়ারপোর্টের গেটে ভারতীয় সৈন্যরা বসেছে। যাকে-তাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার সুলতানের সঙ্গে দেখা। গোটা বিমানবন্দর বুঝে নিচ্ছেন তাঁর লোকজনসহ।

একটু পরেই এলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল সগত সিং। ভারতীয় কোর কমান্ডার। এখন বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান। জেনারেল সগত বললেন, একটু পরেই আমরা কুমিল্লা, সিলেট প্রভৃতি এলাকায় যাব। সঙ্গে আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি বাহিনীর জেনারেল নিয়াজি, এয়ার ভাইস মার্শাল এনামুল হক এবং রিয়ার অ্যাডমিরাল ইনামও যাবেন। আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি ফৌজের সব ঘাঁটি আমি ঘুরে দেখতে চাই। ওদেরও সঙ্গে যেতে বলেছি।

আজ সকালে এখানে একটি বাংলা খবরের কাগজ বেরিয়েছে। জেনারেল সিং কাগজটি দেখতে চাইলেন। প্রথম পৃষ্ঠায় শেখ সাহেবের ছবি। তাঁরই পাশে শ্রীমতী গান্ধীর ছবি। নিচে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের ছবি। জেনারেল ছবিগুলো দেখে বললেন, ভালোই তো কাগজ মনে হচ্ছে, কী লিখছে? আমরা পড়ে পড়ে সব শোনালাম। জেনারেলকে দেখালাম তাঁরও ছবি রয়েছে আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে। জেনারেল কাগজটি আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন।

আধা ঘণ্টার মধ্যে আর একটি গাড়িতে এলেন নিয়াজি, ইনামুল হক ও ইনাম। তাঁরা নেমেই জেনারেল সগত সিংকে স্যালুট করলেন। জেনারেল সিং সবার সঙ্গে করমর্দন করলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিকও এসে হাজির হয়েছেন। তাঁরা কলকাতা ফিরে যেতে চান।

জেনারেল সিং জানালেন, 'আশা করি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতার সঙ্গে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তখন আপনাদের যাতায়াতে অসুবিধা হবে না।'

আমরা জেনারেল নিয়াজিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এখন বক্তব্য কী?

জেনারেল নিয়াজি বললেন, কী আর বলব বলুন।

একজন বিদেশি সাংবাদিক জানতে চাইলেন, কবে পশ্চিম পাকিস্তান যাচ্ছেন?

নিয়াজি করুণ হাসি হেসে বললেন, এখন তো আর আমার হাতে নয়!

জেনারেল নিয়াজি আমাদের কাছে জানতে চাইলেন, আপনারা কোন ভারতীয় সংবাদপত্রের লোক?

বললাম।

জানতে চাইলেন, কবে এসেছেন এবং কীভাবে?

বললাম, আপনার আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের আগে।

একজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার জেনারেল নিয়াজিকে দিয়ে পাঁচ টাকার পাকিস্তানি নোটে সই করিয়ে নিলেন। আমার কাছে বাতিল পাকিস্তানি একটি ১০০ টাকার নোট ছিল। নিয়াজিকে বললাম, সই করে দেবেন?

জেনারেল বললেন, কিন্তু এ তো ১০০ টাকার নোট।
আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে বাতিল ১০০ টাকার নোট। আগেই বাতিল হয়ে গিয়েছে।
নিয়াজি হেসে বললেন, আমিও তো বাতিল হয়ে গিয়েছি।
অন্য সঙ্গী তখন একটু দূরে সরে গিয়েছে। আমি নিয়াজিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বলেছিলেন কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবেন না। করলেন কেন শেষ পর্যন্ত?
নিয়াজি বলতে যাচ্ছিলেন, দেখ, ভাইসব হাম তো জরুর ও বাত বোল থা। যে কিনা...।
হঠাৎ জেনারেল সগত সিং এগিয়ে এসে নিয়াজিকে বললেন, ইউ সি লাস্ট ওয়ার্নিং। আই মেট লায়লা।
নিয়াজি এগিয়ে গেলেন বললেন, রিয়েলি! কোথায়? আমার প্রশ্নের জবাব আর পেলাম না। দুই জেনারেল অন্য আলোচনায় চলে গেলেন।
ইনামকে প্রশ্ন এবং ইনাম সেই প্রশ্নের জবাবে বলেন, ইউ সি। তোমাদের সেনাবাহিনী অনেক বড় ছিল। তোমাদের বিমানবাহিনীও। এই লড়াইয়ে জয় সম্ভব নয়!
ইনামুল হককে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এয়ারফোর্স এত চট করে খতম হয়ে গেল কেন?
এয়ার ভাইস মার্শাল বললেন, তোমাদের বাহিনী অনেক বড়। তার সঙ্গে আমার দুই স্কোয়াড্রন পারবে কেন?
রিয়ার অ্যাডমিরাল বললেন, তার চেয়েও বড় অসুবিধা কার্যত আমাদের একটিমাত্র বিমানবন্দর থেকে অপারেট করতে হয়েছে। এভাবে বিমানযুদ্ধ চালানো যায় না। তোমাদের এয়ারফোর্স দক্ষ এবং অনেক বড়। তা ছাড়া ওদের বাহিনী অনেক বড়।
হঠাৎ বিমানবন্দরের পেছন দিক থেকে মেশিনগানের গুলির আওয়াজ এল। একসঙ্গে অনেকগুলো। একটু থামল। আবার একঝাঁক গুলি। আমরা সবাই শেল্টার নিলাম। কিছু গুলি ছুটে এল বিমানবন্দরের টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের ভেতরে। আমাদের জওয়ানেরাও জিপে করে এবং দৌড়ে ছুটে গেল। মেশিনগান রাইফেলসহ। যেদিক থেকে গুলি আসছিল সেদিকে।
আমি নিয়াজিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সৈন্যরা আত্মসমর্পণের পরও গুলি চালাচ্ছে কেন?
নিয়াজি বললেন, এরা ঠিক আমার ফোর্স বলে মনে হয় না। তবে কিছু লোক এখনো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। তারা খবরই জানে না। তারা এসব করতে পারে। কী করব বলুন।
একটু পরেই বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি ডাকোটা এসে নামল। এলেন ভারতীয় বিমানবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কিছু লোক। বিমানবন্দরে তখন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীরও কিছু লোক এসেছেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরে নামলেন। ভারতীয় বিমানবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন সিংকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর তিনজন পাইলট তুলে ধরে কিছুক্ষণ সোল্লাসে ঘোরালেন। সবাই একসঙ্গে ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি দিলেন।
জেনারেল সিং এখন নিয়াজি, ইনামুল হক ও ইনামকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। জেনারেলদের নিয়ে যাওয়ার হেলিকপ্টার তখনো আসেনি।
একটু দূরেই হাজার খানেক বাঙালি জড়ো হয়েছেন। তাঁরা চিৎকার করলেন, নিয়াজি খুনি। নিয়াজিকে খুন করো। নিয়াজিকে পালাতে দিয়ো না।
জেনারেল সগত সিং ওদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের জওয়ানেরা উত্তেজিত জনতাকে ঠেলে রাখার চেষ্টা করছে। এখন সকাল সোয়া ১০টা।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১

পরিকল্পিত ও কলঙ্কিত গণহত্যা

এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে গণহত্যার তুলনামূলক গবেষণায় বাংলাদেশের গণহত্যা বেশ স্বল্পই পরিচিত। ব্যাপারটা আমিসহ আরও বেশ কয়েকজন আমাদের মতো করে প্রতিবিধানের চেষ্টা করে যাচ্ছি। বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সে সময়ে বাংলাদেশের যে অবস্থান, এই পুরো ব্যাপারটাই আসলে এ দেশটির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আগ্রহ ও অন্যান্য হস্তক্ষেপের কারণে তা ঘটে থাকতে পারে। এত কিছুর পরও তুলনামূলক বিচারে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা বিশ শতকের অন্যতম ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক গণহত্যাগুলোর একটি। ৩০ লাখ মানুষ সেই গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন। কল্যাণ চৌধুরীর জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ এবং ব্রিটিশ সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের বই পড়ে আমার ধারণা হয়েছে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বাঙালি নিধনের সঙ্গে আধুনিক সময়ের বেশ কিছু নৃশংসতার মিল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার অটোমান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টান নিধন, চীনে জাপানি হত্যাযজ্ঞ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ব ইউরোপে নাৎসিদের হত্যাযজ্ঞ। ১৯৭১ সালে গণহত্যার মাত্রা ও হত্যাযজ্ঞের পদ্ধতিগত চরিত্র ও ধ্বংসযজ্ঞ যেকোনো বিচারেই শ্বাসরুদ্ধকর।

ইতিহাসের অন্যান্য গণহত্যার পেছনে যে ধরনের জাতি, গোত্র ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ইন্ধন জুগিয়েছে, ঠিক তেমনি কারণেই একইভাবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশিদের হত্যা করা হয়েছিল। আমরা যদি এই গণহত্যার শিকড়ের সন্ধান করি, তাহলে এর কিছু আদর্শগত ভিত্তি পরিষ্কারভাবেই আমাদের চোখে পড়বে। পাকিস্তানি জেনারেলরা চিরদিনই বাঙালিদের নিচু চোখে দেখত। এমনকি তাদের দৃষ্টিতে বাঙালিরা ছিল মনুষ্যত্বের জাতি। পাকিস্তানি জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজিই বাঙালিদের 'নিচু ভূমির নিচু জাতের মানুষ' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

তবে আদর্শগত বা গোষ্ঠীগত বিদ্বেষের বিষয়টি দিয়ে গণহত্যার বিস্তার অনেক সময় বোঝানো যায় না। অনেক ক্ষেত্রে কিছু রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণেও গণহত্যা ছড়িয়ে পড়তে পারে। যে তরফ থেকে গণহত্যা সংঘটিত হয়, সেই রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও পরিস্থিতিকে যারা হুমকি মনে করে, বিশেষ করে তারা এর শিকার হয়। বাংলাদেশের গণহত্যার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি পুরোপুরি দৃশ্যমান। বাংলাদেশে মানুষের স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ডের প্রত্যাশাকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখা হয়েছিল। একই সঙ্গে বাঙালিদের উত্থানকে সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানি 'এলিট' শ্রেণিও হুমকির চোখে দেখেছিল। যেকোনো গণহত্যাকে সবার মধ্যে একধরনের বিচারবুদ্ধিহীন ব্যাপার হিসেবে চিত্রিত করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা ছিল পুরোপুরি ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে করা। সে পরিকল্পনার জন্ম পশ্চিম পাকিস্তানি এলিট ও তাদের পূর্ব পাকিস্তানি দোসরদের মাথা থেকে, যারা ক্ষমতার বলয়ে নিজেদের কর্তৃত্বের ভিত মজবুত করতে চেয়েছিল। তারা নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় মুছে ফেলে।

১৯৭১ সালে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের কতটুকু পূর্বপরিকল্পিত ছিল, এ নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। তবে এই হত্যাযজ্ঞে যে ধরনের ভয়ানক ভীতির সঞ্চার করা হয়েছে, হত্যাযজ্ঞের কারণে যে পরিমাণ মানুষকে ভিটেছাড়া করা হয়েছে, তাতে বাঙালি প্রতিরোধকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা খুবই স্পষ্ট।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা সংঘটনে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এগিয়েছিল একটি বিশেষ কৌশল নিয়ে। এই গণহত্যার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল তিন ধরনের শ্রেণিকে ১. বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও এলিট শ্রেণি, ২. বাঙালি রাজনৈতিক নেতারা এবং ৩. পুরুষ শ্রেণি।

বাঙালি জাতির শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা মননে ও চিন্তায় বাঙালি জাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, পাকিস্তানি জান্তা সংগত কারণেই তাঁদের হত্যার পরিকল্পনা করে। কেবল বুদ্ধিজীবী শ্রেণিই নন, পাকিস্তানি জান্তার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন সংস্কৃতিসেবী, সাংবাদিক,

এমনকি ক্রীড়াবিদেরাও। মোট কথা, যাঁরাই ভাবনা ও চিন্তায় বাঙালি পরিচয় ও সংস্কৃতির ধারক ছিলেন, তাঁদেরই পাইকারি হারে হত্যার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী ও বাঙালিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদেরও হত্যার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছিল। কেবল আওয়ামী লীগেরই নয়, বাঙালিদের অধিকারের সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থনকারী যেকোনো রাজনৈতিক কর্মীই ছিলেন ১৯৭১ সালে সামরিক জান্তার লক্ষ্যবস্তু। বেছে বেছে বাঙালি পুরুষ ও বালকদের হত্যা করার পেছনেও পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানিদের। যেহেতু বাঙালি এলিট শ্রেণি, সামরিক সদস্য ও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবেই বেশি, তাই নির্দিষ্ট করে আলাদা আলাদাভাবে কাউকে লক্ষ্য না বানিয়ে পাইকারি হারে পুরুষদের হত্যা করার মধ্য দিয়েই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিল।

বিভিন্ন সাহিত্যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আরও একটি লিঙ্গভিত্তিক কৌশলের ব্যাপার উঠে এসেছে। সেটা হলো বাঙালি নারীদের ধর্ষণের বিষয়টি। ধর্ষণের পর নারীকে হত্যাও লিঙ্গভিত্তিক ঘৃণা ও ধর্ষণের অপরাধকে ধামাচাপা দেওয়ার বিষয় হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। ধর্ষণের উদ্দেশ্য কেবল একজন নারীকে শারীরিকভাবে আঘাত করাই নয়, এটা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর বন্ধনের ভিত্তিমূলেও চরম আঘাত। এই আঘাতটা মূলত করা হয় ধর্ষণের জন্য নারীকে আলাদা করেই। পুরুষকেও এর মধ্য দিয়ে অপমান করার একটা প্রবণতা থাকে। একটি গোষ্ঠীর নারীকুলকে ধর্ষণের মধ্য দিয়ে সেই গোষ্ঠীর পুরুষদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে তারা 'তাদের' সমাজের মেয়েদের অবমাননার হাত থেকে বাঁচাতে কতটাই না অপারগ। সে কারণে অজস্র ধর্ষিতা নারী এবং নিঃস্ব ও রিক্ত বিধবারা গণহত্যা-পরবর্তী বাংলাদেশের বিশেষ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল। যেকোনো গণহত্যার ক্ষেত্রেই একে দুঃসহ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

রবার্ট পেইন তাঁর ম্যাসাকার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, '১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে পদ্ধতিগত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল।' তিনি আরও বলেন, এই হত্যাকাণ্ডগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা তরুণ সেনাসদস্যদের রক্ত বা মাথা গরম করা ব্যাপারস্যাপার ছিল না। এটি ছিল একেবারে উচ্চপর্যায় থেকে পরিকল্পিত ঠান্ডা মাথার হত্যাকাণ্ড। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কেতাদুরস্ত কর্মকর্তারা, যাঁরা ১৯৭১ সালের নয় মাস কোনো না কোনো সময় বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই এই গণহত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। তাঁরা প্রত্যেকেই জানতেন, তাঁরা আসলে কী করছেন। অশিক্ষিত সৈনিক, অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত জেসিও ও এনসিওদের ওই অফিসাররাই ব্রিফ করতেন যে এখানে তাঁরা যা কিছু করবেন (হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ) তা সবই পাকিস্তানের জন্য।

আগেই বলা হয়েছে যে এই নিধনযজ্ঞ উৎসারিত হয়েছে মূলত বাঙালি-বিদ্বেষ থেকে। জেনারেল নিয়াজি জুনিয়র অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে বাঙালিদের অভিহিত করতেন 'ইঁদুর' ও 'মুরগি' হিসেবে। একজন শিক্ষিত ও এলিট ব্যক্তির মুখে এ ধরনের জাতি-বিদ্বেষমূলক মন্তব্য থেকে জুনিয়ররা বাঙালি মারার উদ্দীপনা খুঁজে নিত।

ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, কানাডার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অ্যাডাম জোনসের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ২০১৪ সালের ২৯ মার্চ দেওয়া বক্তৃতার অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন নাইর ইকবাল

মিরপুর শত্রুমুক্ত করার অভিযান

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের পরপর মিরপুর এলাকায় বিহারি রাজাকার ও লুকিয়ে থাকা বেশ কিছু পাকিস্তানি সৈন্যের সংগঠিত প্রতিরোধ সদ্য স্বাধীন দেশের নিরাপত্তা মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। পাকিস্তানিদের সরবরাহ করা বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ মিরপুরের বিহারিদের হাতে ছিল। বেশ কিছু পাকিস্তানি সৈন্য, ইপিসিএএফ ও মুজাহিদ সদস্য বিহারিদের বাসাবাড়িতে লুকিয়ে থেকে তাদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিল। মিরপুরের বিহারিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে এই অবস্থা মেনে নেওয়ার কোনো কারণ ছিল না। বাংলাদেশ বাহিনীর প্রধান জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী মিরপুরের অচলাবস্থা কাটাতে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল, চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে মিরপুরে মোতায়েনের আদেশ দিলেন।

আমি তখন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক। আমার ব্যাটালিয়ন ছিল জয়দেবপুর রাজবাড়িতে। আদেশ পেয়ে আমি জয়দেবপুরে ব্যাটালিয়নের একটি ক্ষুদ্র অংশ বা রিয়ার পার্টি রেখে বাকি ব্যাটালিয়ন নিয়ে মিরপুরে গেলাম। মিরপুরের ১০, ১১ ও ১২ নম্বর সেকশনের দায়িত্ব দেওয়া হলো দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলকে। ৫ ও ৬ নম্বর সেকশনের দায়িত্ব দেওয়া হলো নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আর আমার ব্যাটালিয়নের দায়িত্বে দেওয়া হলো ১ ও ২ নম্বর সেকশন।

দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে মেজর মইনুল হোসেন (পরে মেজর জেনারেল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা) ও মেজর আইনুদ্দীন (পরে মেজর জেনারেল)। আমাদের স্ব স্ব এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মিরপুরের চলমান অরাজক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সেখানে বাংলাদেশ সরকারে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব দেওয়া হলো।

রেকি ও সৈন্য মোতায়েন

মিরপুর পৌঁছে সেখানকার বিজ্ঞান একাডেমির একটি ভবনে আমাদের সদর দপ্তর স্থাপন করলাম। প্রথম দিনেই চেষ্টা করলাম ১ ও ২ নম্বর সেকশন এলাকা নিজে রেকি করে বিহারিদের অবস্থান কতটা শক্ত সেটা আন্দাজ করতে। আমি আশ্চর্য হলাম যে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বিহারিরা স্বয়ংক্রিয়, আধা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, এলএমজি ও স্টেনগান নিয়ে বেশ শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে। আমি ১ নম্বর সেকশনে মিরপুর মাজারে দুটি কোম্পানি এবং ২ নম্বর সেকশনে একটি পরিত্যক্ত পুকুরের চারপাশে দুটি কোম্পানিকে অবস্থান নিতে নির্দেশ দিলাম। আমার কোম্পানিগুলোর অবস্থান তদারক করার সময় আমি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালিদের ওপরে চালিত বিহারিদের নিষ্ঠুর গণহত্যার কিছু নিদর্শন স্বচক্ষে দেখতে পেলাম।

মাজারের পাশেই ছিল একটা মজা পুকুর। দেখতে পেলাম, পুকুরপাড়ের নানা জায়গায় মাটি খোঁড়া। ওই আলগা মাটি সরালেই দু-একটা মানুষের লাশ পাওয়া যেতে লাগল। একটি জায়গায় দেখলাম, মাটির নিচ থেকে একটা মহিলার কাচের চুড়িপরা হাত বেরিয়ে আছে! মাটিগুলো সরিয়ে ফেলার পর তাঁর মৃতদেহটি বেরিয়ে এল। শুধু ব্লাউজ পরা নগ্ন মৃতদেহ। তাকে জবাই করা হয়েছিল। বীভৎস দৃশ্য!

সেই হতভাগিনীর লাশ কবর থেকে ওঠাতেই ছোট্ট শিশু কোলে কাছের টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোক

ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'স্যার, এটা আমার স্ত্রীর লাশ। আমার কোলের শিশুটির মা।' আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলাম না।

আমার সৈনিকদের আরও লাশের সন্ধান করতে বললাম। মজা পুকুরটির প্রায় মাঝখানের তলদেশে মাটি খুঁড়ে একটি গণকবর থেকে আমরা পাঁচ-ছয়টি নর-নারীর লাশ উদ্ধার করলাম। তাদের প্রত্যেকের শরীরে নিষ্ঠুর নির্যাতন ও আঘাতের চিহ্ন ছিল সুস্পষ্ট।

বিহারিদের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ

২ নম্বর সেকশনে প্রবেশের সময় আমরা শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলাম। রাস্তার পাশে একটা পাকা একতলা বাড়ি থেকে আমাদের ওপর বৃষ্টির মতো এলএমজির স্বয়ংক্রিয় গুলি আসছিল। রাইফেল দিয়ে বাড়িটির জানালায় বহুক্ষণ ধরে গোলাগুলি করেও ওই গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে পারছিলাম না। বাধ্য হয়ে আমি ৭৫ মিলিমিটার রিকয়েললেস রাইফেল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সাপোর্ট কোম্পানি থেকে একটি রিকয়েললেস রাইফেল এসে ফায়ারে অবস্থান নিল।

আমি মাইক লাগিয়ে প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে দিলাম, তারা গোলাগুলি বন্ধ করে আত্মসমর্পণ না করলে তাদের ধ্বংস করে দিতে বাধ্য হব। প্রত্যুত্তরে ওই বাড়িতে থাকা বিহারিরা অশ্রাব্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করতে লাগল। এরপর জানালাটি লক্ষ্য করে রিকয়েললেস রাইফেলের গোলা দাগার সঙ্গে সঙ্গে সব গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল। আমি আমার একটি প্লাটুনকে ওই বাসায় তল্লাশি করতে পাঠালাম। তারা ফিরে এসে জানাল, ওখানে কয়েকজন আহত বিহারি ছাড়া আর কোনো সক্ষম শত্রু নেই। সেখানে বিহারিদের দুটি এলএমজি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

আহত বিহারিদের আমার ব্যাটালিয়নের এমআই রুমে চিকিৎসা দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুলিশের হাতে সোপর্দ করলাম। এই ঘটনার পর ২ নম্বর সেকশনের দখল বিনা বাধায় চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের হাতে চলে এল। বিহারিরা একটিবারের জন্যও আর আমার সৈন্যদের ওপরে গুলি করার সাহস দেখায়নি।

এক সৈনিক কোথা থেকে আমার কাছে একটি কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে এল। আমি হতবাক হয়ে দেখলাম, তাতে অনেকগুলো মানুষের চোখ জড়ো করে রাখা হয়েছে! গণহত্যার শিকার বাঙালিদের চোখ। আমার সৈন্যদের উত্তেজনা ফেটে পড়ার জোগাড় হলো। অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তাদের কিছুটা শান্ত করলাম। আমি আমার একজন নায়েব সুবেদারের নেতৃত্বে ৪০ জন সদস্যের একটা টিম করে তাদের ওপরে সন্দেহভাজন বাঙালি হত্যাকারীদের শনাক্ত করার দায়িত্ব দিলাম; বাকি সেনাদের সরাসরি বিহারিদের ওপরে কোনো প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দিলাম না। এভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করলাম।

লে. কর্নেল (অব.) এইচ এম এ গাফফার প্রকাশিতব্য গ্রন্থ থেকে
লে. কর্নেল (অব.) এইচ এম এ গাফফার: সাবেক সেনা কর্মকর্তা

মায়ের ছবি দেখে

আমার মা শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীনের এই ছবিটা দেখে অনুভূতি হলো একটু অন্য রকম—মনটা বিষণ্নতায় ভরে গেল। আমি ফিরে গেলাম ১৯৯১ সালে। সে বছর প্রেসক্লাবে আফতাব আহমেদের একটি ছবি প্রদর্শনী চলছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তোলা তাঁর ছবিগুলো। পরে তিনি একটি ছবির অ্যালবামও প্রকাশ করেন 'আমরা তোমাদের ভুলব না' শিরোনামে।

মায়ের লাশের ছবি আমি সেই প্রদর্শনীতেই প্রথম দেখতে পাই। মাকে যখন আলবদর বাহিনীর লোকেরা আমার সামনে থেকে চোখ বেঁধে অপহরণ করে নিয়ে যায়, সেটাই তাঁর শেষ যাওয়া। সেটা ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর দুপুরবেলা। মাকে আর দেখিনি। মা ফিরেও আসেননি। তাঁর কিছু নিদর্শনের ভেতরেই তাঁর অস্তিত্বকে আমি খুঁজে ফিরেছি। ১৯৯১ সালেই আমাদের শহীদ সন্তানদের একটা সংগঠন হয়েছিল প্রজন্ম '৭১ (মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সন্তানদের সংগঠন)। এ সংগঠনের ব্যানারে আমরা একটা অনুষ্ঠান করি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক (টিএসসি) মিলনায়তনে। সেখানে আমি এক বক্তাকে আবিষ্কার করি। নাম দেলোয়ার হোসেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা, তিনি আমার মাকে দেখেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আমার মা কী বলেছিলেন, সে কথাও তিনি বলেছিলেন বক্তৃতায়। এরপরই আমার ভেতরে মাকে নিয়ে কিছু করার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে আমার শ্রদ্ধেয় ছোট মামা অধ্যাপক ডা. শাহাবুদ্দীনের প্রেরণায় আমরা শুরু করি মায়ের স্মৃতি সংরক্ষণের নানান কার্যক্রম। এর অংশ হিসেবে তাঁকে নিয়ে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের কাজও শুরু হয়। বইটি প্রকাশের কাজে হাত দিয়ে জানতে পারি, মায়ের সঙ্গে কারা পরিচিত ছিলেন; কারা তাঁকে চিনতেন, জানতেন, তাঁর সহকর্মী বা সহযোদ্ধা ছিলেন। সবার কাছ থেকে মায়ের সম্পর্কে লেখা সংগ্রহ করতে গিয়ে খুঁজে পাই অনেক ছবি, পরিধেয় বস্ত্র, হাতের রেখার নিদর্শন। একটি স্ট্যাম্পবুক। আমাকে দেওয়া মায়ের কিছু বই। এই স্মারকগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে প্রকাশের আগ মুহূর্তে প্রথম আলোয় একটি ছবি দেখে আমি আঁতকে উঠি। সেখানে ছিল রায়েরবাজার বধ্যভূমি থেকে মায়ের লাশ উত্তোলনের ছবিটি। ছুটে যাই প্রথম আলো কার্যালয়ে। যোগাযোগ করি ওই পত্রিকার সাংবাদিক আমার বন্ধু, মিতা জাহীদ রেজা নূরের সঙ্গে। ওঁকে অনুরোধ করি, ২০০৬-এর ১৪ ডিসেম্বর ওই দৈনিকে প্রকাশিত ছবিটি আমাকে দেওয়ার জন্য। ছবিটি তুলেছিলেন ইরানের আলোকচিত্রী মি. আব্বাস, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে। এ ছবিটি সংযোজন করতেই আমাকে বইয়ের ফর্মা পরিবর্তন করতে হয়। বইটি আমরা ফেব্রুয়ারির মেলায় প্রকাশ করতে পারিনি। বইটি প্রকাশ করি ৮ মার্চ ২০০৭ বিশ্ব নারী দিবসে। বইটি এখন পাওয়া যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে।

২০০৭ থেকে ২০১৫-এর ডিসেম্বর—ঠিক ৮ বছর পরে ৮ ডিসেম্বর আবারও প্রথম আলো কার্যালয়ে এলাম। তবে এবার আমাকে ডাকা হলো প্রথম আলোর পক্ষ থেকেই। জানানো হলো, আমার মা সেলিনা পারভীনের একটি নতুন ছবি খুঁজে পাওয়া গেছে—রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে তাঁর লাশ। ছবিটি তুলেছিলেন ভারতীয় আলোকচিত্রী রবীন সেনগুপ্ত। এই মর্মান্তিক ছবিটি দেখেই আবার মনে পড়ল দেলোয়ার হোসেনের বলা কথাগুলো। মা মৃত্যুর আগে যা বলেছিলেন, তা আমি শুনেছিলাম তাঁর কাছ থেকে। ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত কিংবা ১৫ ডিসেম্বর সকাল অবধি ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে বাঙালি জাতির বিবেক দেশবরেণ্য সাহিত্যিক, কবি, চিকিৎসক, প্রকৌশলীদের তালিকা তৈরি করে বাসা থেকে অপহরণ করে মোহাম্মদপুরের শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রে বন্দী করে নির্যাতন করেছিল আলবদররা। আমার মাকে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে ওখানেই বন্দী ছিলেন তিনি। তাঁদের সবার চোখ আর হাত বাঁধা ছিল। এই দীর্ঘ সময় তাঁদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল। এবং শেষ মুহূর্তে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়

করানো হয়েছিল। সেই সময় আমার মাসহ সবাই বুঝে ফেলেছিলেন, এই হয়তো তাঁদের জীবনের শেষ মুহূর্ত। মা তখন ওদের অনুনয়-বিনয় করছিলেন তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। বলেছিলেন, 'ঘরে আমার আট বছরের একটা সন্তান আছে, ও না খেয়ে আছে। ও আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। শুধু এই শিশুটির কথা চিন্তা করে আমাকে ছেড়ে দাও।'

হায়েনারা তাদের বন্দুকের বেয়নেট চার্জ করে মায়ের মুখ ফেঁড়ে দেয়। তিনি তখন আরও জোরে চিৎকার করতে থাকেন। কথা অস্পষ্ট হয়ে যায়, তারপরও যতটুকু বোঝা যায়, তিনি বলতে থাকেন, 'আমি আর এই শহরে থাকব না, লেখালেখি করব না। ছেলেকে নিয়ে অনেক দূরে চলে যাব।' তাতেও আলবদর বাহিনীর ওই নরপিশাচদের এতটুকুও করুণা হয়নি, বরং বেয়নেট চার্জ করে এবং গুলি করে মাকে তারা হত্যা করে। মৃত্যু জেনেও যে মা তাঁর সন্তানের কথা ভুলতে পারেননি, সেই মাকে, সেই মায়ের মৃতদেহের স্মৃতি কখনোই মুছে যাবে না আমার অন্তর থেকে। আর তাই ছবিটি দেখেই আমি বুঝে যাই, এই আমার সেই মা। আমি স্থির হয়ে যাই। বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকি, কথা বলতে পারি না, আবেগও ধরে রাখতে পারি না। হয়তো এটাই স্বাভাবিক।

বর্তমান সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম করছে, সে জন্য আমাদের শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে তারা ধন্যবাদ পাবে। কিছুদিন আগে আরও দুজন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায় হয়েছে। এটি ছিল চৌধুরী মঈনুদ্দীন ও আশরাফুজ্জামানের রায়। কিন্তু সে রায় কার্যকর হয়নি, অপরাধী দুজন পলাতক। আমি বলব, এই বিচার কার্যক্রমে আমাদের আংশিক দায়মুক্তি ঘটেছে। সব মানবতাবিরোধী অপরাধীর বিচার হলেই কেবল আমরা দায়মুক্ত হতে পারব। যুদ্ধের পর থেকেই আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বরাবরই চেয়ে এসেছি। শহীদজননী জাহানারা ইমাম থেকে শুরু করে শাহবাগের গণজাগরণ পর্যন্ত পুরো সময়টাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিকে বেগবান করেছে। এত দিন পর হলেও শেষ পর্যন্ত যে এদের বিচার হচ্ছে, এটাই স্বস্তির। অপরাধীর বিচার না হলে পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করত না।

মো. সুমন জাহিদ: শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীনের ছেলে

ভয় নেই

আমি যখন যুধ্যমান বাংলাদেশে, আমার মেয়ে পুপে তখন দক্ষিণ কলকাতার এক স্কুলে, প্রাইভেট স্কুল—ফাইনালের টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছিল।
ফিরে এসে বাড়িতে পুপের গল্প শুনলাম। হলে যখন একটি মেয়ে ঢুকছিল, তাতে ওরা আপত্তি করে। মেয়েটি ছুটে গিয়ে ওদের শাসায়—পরীক্ষার শেষ দিনে তোমাদের দেখে নেব। বন্ধুরা ঘাবড়ে গেলে পুপে তাদের সাহস দেয়, কিস্যু হবে না, ও হলো সপ্তম নৌবহর।
সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, আমি তখন যশোর-খুলনা রোডে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। রেডিওতে খবর দিয়েছে মার্কিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসে ভিড়েছে। তখনো প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে দৌলতপুরে। ক্যাম্পে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালাম। কেউ বিন্দুমাত্র ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। কিন্তু রেগে আগুন হয়ে গেছে।
ভয় না পাওয়ার একটা কারণ ছিল। রেডিওতে বলেছিল, সোভিয়েতের নৌবহর ভারত মহাসাগরের দিকে যাত্রা করেছে।
পুপের গল্পটা শুনে খুব হেসেছিলাম। সপ্তম নৌবহর নিয়ে ঠাট্টা করার জন্যই শুধু নয়। আসলে এর মধ্যেও একটা ঢোকার ব্যাপার ছিল বলে। ধাড়ি নিক্সন নকল করছিলেন চীনকে।
পঁচিশে মার্চের ঘটনা যখন ঘটে, আমি আর সাজ্জাদ জহীর তখন উত্তর ভিয়েতনামের এক গ্রামে। হ্যানয়ে পা দেওয়ামাত্র ডক্টর শেলভাঙ্কর হোটেলে ফোন করলেন, খবর আছে। এক্ষুনি চলে এসো।
পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে শুনে আমি লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু খবরের একমাত্র সূত্র বিবিসি কিংবা ভয়েস অব আমেরিকা।
সাজ্জাদ জহীর উত্তর ভারতের লোক। প্রথম যৌবনেই ব্যারিস্টারি ছেড়ে সর্বক্ষণের কমিউনিস্ট কর্মী হন। দেশভাগের পর তিনি হয়েছিলেন পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক। আত্মগোপন করে থাকার সময় পাকিস্তানি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে পাকিস্তানি সরকার তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার উপক্রম করেছিল। আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনের জোরে ছাড়া পেয়ে তিনি ভারতে ফিরে আসেন।
বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, এ বিষয়ে আমরা ছিলাম নিঃসংশয়। সাজ্জাদ জহীর পশ্চিম পাকিস্তানকে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে আমারও কিছুটা জ্ঞান ছিল। তবে স্বীকার করতেই হবে, আমাদের বিশ্বাসের আরও একটা জমি ছিল। সে জমি উত্তর ভিয়েতনাম। একটা দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাধীনতা চাইলে দুনিয়ার সবচেয়ে জবরদস্ত শক্তিও তার কাছে হার মানে। আমাদের পায়ের নিচে ভিয়েতনামের মাটি, আমাদের চোখের সামনে ভিয়েতনামের মানুষই তার প্রমাণ।
আরও একটা ভরসা ছিল। সে ভরসা হলো সোভিয়েত দেশ। তারও প্রমাণ মিলেছিল ভিয়েতনামের মাটিতে। জানতে, বুঝতে, যাচাই করতে সময় লেগেছে, কিন্তু সময়মতো হাত বাড়াতে দেরি হয়নি।
ভয় কি পাইনি কখনো? বারবার পেয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস হারাইনি।
পেট্রাপোলের রাস্তায় যখন দেখেছি বাঁধভাঙা বন্যার মতো শরণার্থীরা আসছে, প্রায়ই ভেবেছি এবার আমরা ডুবে যাব। ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে উদ্ধারকারীও যেমন ডুবে যায় সেভাবে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, প্রচুর নাকানিচুবানি খেয়েছি বটে, কিন্তু আমরা কেউই ডুবে যাইনি।
নবাগত শরণার্থীকে জিজ্ঞেস করেছি, কেন চলে এলে? বলেছে, মুসলমানেরা তাড়িয়ে দিয়েছে। সে লড়াইয়ের কথা গ্রামে থাকতে জানতে পারেনি, জেনেছে শিবিরে এসে। দেখেছে তারই মতো অন্য গ্রাম থেকে দলে দলে এসেছে সর্বস্ব হারিয়ে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান। ধর্মের বাঁধনের জায়গা নিয়েছে ভাষার মেলবন্ধন।
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার ভয়ে আমরা কাঁটা হয়ে থেকেছি। প্ররোচনার অভাব হয়নি। কিন্তু তাতে কোথাও কোথাও বড়জোর দেখা দিয়েছে উত্তেজনা। কিন্তু সবাই সজাগ থাকায় ঘটনা বেশি দূর গড়াতে পারেনি।
পেট্রাপোল শিবিরের সেই কর্মাধ্যক্ষের কথা ভুলব না। শরণার্থীর অন্তহীন ভিড়ে যখন নিজের স্নান-খাওয়াও মাথায় উঠেছে, তখন তিনি দেখালেন ক্যাম্পের ছাত্রদের জন্য যাতে বই-খাতার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য ওপরে তিনি

চিঠি লিখেছেন।
বললেন, ক্যাম্পে পড়ানোর মাস্টারের অভাব হবে না। তা ছাড়া আমরা যা খেতে দিই তাতে আধপেটও হয় না। কাজের মধ্যে থাকলে তবু ওরা খানিকক্ষণ খিদের কথাটা ভুলে থাকতে পারবে। তাঁর রিটায়ার করার প্রায় সময় হয়ে এসেছে। কাজ দেখিয়ে তাঁর চাকরির ভবিষ্যৎ ভালো হবে, সে আশাও ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম এপারের মানুষকেও ছুঁইয়ে দিয়েছিল আগুনের স্পর্শমণি।
কলকাতার কত লোককে বলতে শুনেছি এই রিফিউজির দল কি ভাবছেন আর ঘাড় থেকে নামবে? ওরা কেউই আর ফিরে যাবে না।
সন্দেহ করা, অবিশ্বাস করা—এটা কিন্তু একবার বাতিক হয়ে গেলে সে রোগ সারানো মুশকিল।
মুক্ত অঞ্চলের গ্রামে শরণার্থীরা ফিরে যাচ্ছে—এ দৃশ্য আমি দেখে এসেছিলাম ভারতে পাকিস্তানের আক্রমণেরও আগে। ৩ ডিসেম্বর।
এরপর বারো থেকে সতেরোই সাতক্ষীরার রাস্তায়, শহরের অলিগলিতে দেখেছি সাইকেল-রিকশায়, ট্রাকের মাথায় লোক আসছে তো আসছেই। ঢাকা আর খুলনার মুক্তির পর ভয়-সংশয় ঘুচে গেছে। পুঁতে রাখা মাইন, অগ্নিদগ্ধ কিংবা ধূলিসাৎ ঘরবাড়ি, লুট হওয়া দোকানপাট আর আসবাবপত্র, বন্ধ স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত-সমস্যা অনেক। সাতক্ষীরার গায়ে কুমোরপাড়ায় মাটির বাড়িগুলোর একটাও আর দাঁড়িয়ে নেই। সারা পূর্ব বাংলায় এদের তৈরি পুতুলেরই ছিল সবচেয়ে বেশি নামডাক।
গ্রামের রাস্তায় কালীপদ দের সঙ্গে দেখা। ঠিকাদারি করে তাঁর ভালো রোজগার ছিল। একতলা হলেও বেশ বাহারে দালান ছিল। এখন সেটা বিরাট একটা ইটের স্তূপ। দেখতে এসেছিলেন বাড়িতে ফেরা যাবে কি না। সাইকেল হাতে আনমনে শূন্য দৃষ্টিতে ফিরে যাচ্ছিলেন বসিরহাট। বললেন, ফিরে তো আসতেই হবে। কাজ-কারবার সবই তো আমার এখানে।
এক জোর বরাতের গল্প শুনেছিলাম মনিরামপুরে। একজন হিন্দুর একটা একতলা পাকা বাড়ি ছিল। পালিয়ে গেলে এক বিহারি সেটা দখল করে নেয়। পাকিস্তানি ফৌজ চলে গেলে ভদ্রলোক ফিরে এসে দেখেন এর মধ্যে তাঁর একতলা বাড়ি হয়ে গেছে তিনতলা। ইলেকট্রিক ছিল না, ইলেকট্রিক হয়েছে। জবরদখলকারী পাকিস্তানি ফৌজের সঙ্গেই তল্লাট ছেড়ে হাওয়া।
যশোরে থাকতে থাকতেই দেখছিলাম বেশ কয়েকটা বাড়ির বন্ধ জানালাগুলো একে একে খুলে যাচ্ছে।
একটু ভেতর দিকে এমন গ্রামও ছিল, যেখানে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়ে হিন্দুবাড়িতে কর্তাগিন্নিরা থেকে গিয়েছিলেন। পাড়াপড়শিরা তাঁদের আগলে রেখেছিলেন। গ্রামের রাজাকাররাও তাঁদের গায়ে হাত দেয়নি।
একদিন সকালে দেখি থানার সামনে ট্রাকের ওপর বেজায় ভিড়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর বাড়ির বউঝি। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কি সব বাড়ি ফিরে আসছে? বলল, আজ্ঞে না, এখানকারই লোক। মাথাপিছু তিন টাকা দিয়ে বনগাঁ দেখতে যাচ্ছে।
কলকাতায় আমি এমন লোক দেখেছি, যারা মানতেই চাইত না মুক্তিবাহিনীর অস্তিত্ব। কিংবা বলত, ওরা তো সব ইপিআর আর বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভাড়াটে সৈনিক।
বড় রাস্তা আর গ্রামগঞ্জের পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে দেখতাম পিলপিল করে কাতারে কাতারে ফিরে আসছে গেরিলা বাহিনীর লোকজন। খালি পা, গায়ে গেঞ্জি কিংবা শার্ট, পরনে লুঙ্গি কিংবা হাফপ্যান্ট। কাঁধে রাইফেল, হাতে স্টেনগান। বেশির ভাগই চাষি ঘরের ছেলে। ছাত্র কিংবা চাকুরে। যশোরের রাস্তায় দুজনের সঙ্গে দেখা। একজনের খুলনায় ছিল লন্ড্রি, আরেকজন ছিল স্কুলের ছাত্র। 'জয় বাংলা' বলে হাত বাড়িয়ে দিল। দুজনেরই হাতে খোসপাঁচড়ার দাগ। আমাকে আগেই একজন বলেছিল, খোসপাঁচড়ার দাগ দেখলেই বুঝবেন গেরিলা বাহিনীর লোক। পুষ্টিকর খাবার পায়নি, তার ওপর ময়লা, জলকাদার মধ্যে পড়ে থাকতে হয়েছে।
ত্রিমোহনীতে দেখা হয়েছিল আনিসুর রহমানের সঙ্গে। যশোরের এমএম কলেজে অর্থনীতি অনার্সের ছাত্র। বরণডালিতে বাড়ি। আনিসুরের দাদা ইসহাক ছিলেন সরকারি কৃষি ফার্মের চাকুরে। দিনে তাঁর হাতে থাকত কলম। রাতে তিনি মুক্তিসেনা-শত্রুদের লক্ষ্য করে অন্ধকারে তাঁর হাতে গর্জে উঠত বন্দুক কিংবা গ্রেনেড। ও অঞ্চল মুক্ত হওয়ার আগে কেউই সে খবর জানত না।
মুক্তিবাহিনীর আট নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর মঞ্জুরকে স্যালুট করে একগাল হেসে যে লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে কে বলবে যে এক বছর আগেও সে ডাকাত ছিল। তার নাম রাজ আলী দফাদার। ৫১ বছর বয়স। হাসলেই তার ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। তার স্থাবর-অস্থাবর বিষয়সম্পত্তি প্রায় কিছুই ছিল না। থাকবে কী করে? সব সময় কি আর কাজ হতো? কিন্তু দলের লোকদের ১২ মাসই খাওয়াতে-পরাতে হতো। আর তা ছাড়া চারপাশে এত অভাবী লোক, চাইলে তো আর না বলা যেত না। রাজ আলী মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর ঠিক করেছে জীবনের বাকি দিনগুলো সৎ পথে থেকে তার ডাকাত নাম খণ্ডাবে।

খোর্দো গ্রামে আমাদের রাস্তায় আটকে ছিল গেরিলা বাহিনীর ছেলেরা। সরকারি মাল্টিপারপাসের অফিস ঘরে এখন মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি। পাকিস্তানি বাহিনী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলের সব কাজ সম্মিলিতভাবে তারা চালাচ্ছে। এ গ্রামের বীর কিশোর এখন মৈনুদ্দিন। একা ছয়জন শত্রুকে মেরেছে। তার মুখে চোখে কোথাও এতটুকু হিংস্রতা নেই। হাসিটা ভারি মিষ্টি। ক্লাস নাইনে পড়ত। নয়জন ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। খানেরা ওকে দিয়ে ইট বওয়াত। পয়সা তো দিতই না। একদিন ওকে সাত ঘা বাড়ি মারে। সেই দিনই সে বর্ডার পেরিয়ে চলে যায়। তার মনে হয়েছিল খান সেনাদের মেরে না তাড়ালে কিছুতেই তার মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচবে না। মৈনুদ্দিনের ছিল এমন অসমসাহস যে পাকিস্তানি সেনাদের বাংকারে চড়াও হয়েও শত্রু ঘায়েল করতে তার বুক একটুও কাঁপেনি।
আমি যাদের সঙ্গে বাংলাদেশে দিন-রাত কাটিয়েছি, তারা অধিকাংশই ইপিআরের লোক। কেউ তাদের ভাড়াটে সৈনিক বললে সে অপমান আমার নিজের গায়েই বিঁধবে। রক্ষীদলে নাম লেখাতে হয়েছিল জমিজমার অভাবে, পেটের দায়ে। পাকিস্তানি বাহিনীতে, বাঙালি পুলিশ পল্টনকে দেখা হতো ছোট নজরে। জাত তুলে গালাগাল আর অপমান করা ছাড়াও অনেক অধিকার আর সুযোগ-সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। তাই স্বাধীনতার ডাক আসতেই যে যার বন্দুক নিয়ে তারা লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জান দিতেও তাঁরা কসুর করেননি। মাইনে করা পুলিশ পল্টন স্বাধীনতাসংগ্রামের মন্ত্রবলে হঠাৎ যে কী আশ্চর্য চেহারার দেখা দিতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত। হক, জাহাঙ্গীর, মজিদ, নূর ইসলাম—এমন সব মানুষকে নিয়ে বাংলাদেশের যে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল, সে মুক্তিবাহিনী পৃথিবীর যেকোনো সংগ্রামী দেশেরই গর্ব হতে পারত।
নতুন করে তৈরি হচ্ছিল কদমতলার ব্রিজ। মুক্তিবাহিনীরই তত্ত্বাবধানে। নায়েব সুবেদার আতাউর রহমান গল্প বলছিলেন, দলবল নিয়ে খান সেনাদের এই ঘাঁটিতে কবার কীভাবে তাঁরা অন্ধকারে হানা দিয়ে তাদের খতম করেছিলেন। বুলেটে হঠাৎ বেকায়দায় জখম হয়েছিল দিন পঁচিশ আগে। ভোমরা সেক্টরে সকাল সাড়ে নয়টায় ট্রেঞ্চ কাটার সময়। গুলি ডান দিক থেকে বাঁ দিকের পাঁজর ভেদ করে যায়। হাসপাতালে বলেছিল এক মাস শুয়ে থাকতে। কিন্তু দশ-বারো দিন পরেই ফিরে আসেন ইউনিটে। দলে লোক কম ছিল যে।
মাঠে মাঠে ছড়ানো বীভৎস মৃত্যুর মিছিল দেখার পর যশোরে অবাঙালিদের বসতি নিউ টাউনের পাশ দিয়ে আসছিলাম। দুপাশে খাঁ খাঁ করছে বাড়িঘর। হঠাৎ দেখি কয়েকটা পান-সিগারেট আর মুদির দোকান খোলা। দুটো গলিতে দেখলাম রোদ্দুরে ভিড় করে ছেলেমেয়েরা খেলছে। পোশাকে অবাঙালি বলে বোধ হলো।
শহরে এসে শুনলাম এখনো এখানে সেখানে অবাঙালিরা রয়ে গেছে। সেদিন বিকেলেই শহরের প্রধান সড়ক আরএন রোডের এক বস্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম হিন্দিতে কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ কোমর বেঁধে ঝগড়া করছে। পাশ দিয়ে কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ না করে দলে দলে রাস্তায় লোক হেঁটে যাচ্ছে। মুক্তিসেনাদের ঘাড়ে ঝোলানো রাইফেল।
এরপরও কি ভয় করতে হবে?

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
সুভাষ মুখোপাধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত কবি

যে রোগের নাম আলবদর

বদর বাহিনীর লোকেরা অশিক্ষিত ছিল না। অশিক্ষিত লোক হলে তারা নিরীহ বুদ্ধিজীবীদের ঠান্ডা মাথায় হত্যা করতে পারত না, হয়তো তাদের হাত নড়ে উঠত, বুক কাঁপত, হয়তো বা চোখে আসত পানি। রাজাকারদের মধ্যে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ ছিল। কিন্তু অনেকেই রাজাকার হয়েছে জীবিকার তাড়নায়, কেউ কেউ প্রাণের দায়ে, অনেক ক্ষেত্রে রাজাকাররা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়েছে, কোথাও-বা যোগ দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। রাজাকাররা বুদ্ধিজীবীদের চিনত না। অধ্যাপক, সাংবাদিক, ডাক্তার এঁদের বিষয়ে বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না তাদের। তা ছাড়া অল্প কিছু মানুষই রাজাকার হয়েছিল, দেশের অধিকাংশ গরিব-দুঃখী মানুষ বাংলাদেশকে ভালোবাসত, যে বাংলাদেশকে তারা চিনত তাদের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে।

আলবদরদের পরিচয়—তারা খুনি। খুনির কাজ ঘৃণিত কাজ। কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন খুনি হয়, তখন তার পেছনে একটা উত্তেজনা থাকে, থাকে কোনো প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত স্বার্থের প্ররোচনা। আলবদরদের খুন শীতল, নৃশংস এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের অজুহাত-বিরহিত। তাই এই খুন অনেক বেশি ঘৃণার্হ। শুধু তা-ই নয়, খুনি যখন খুন করে তখন তার মধ্যে একটা অপরাধবোধ থাকে, সে জানে সে অন্যায় করেছে, কিন্তু এই খুনিদের মধ্যে সেটা তো ছিলই না, বরং উল্টোটাই ছিল। তারা মনে করেছে খুন করে তারা মস্ত এক মহৎ কাজ করেছে।

আলবদররা খুন করেছে কাকে? খুন করেনি একজন দুজন দশজন এক শজন মানুষকে; তারা খুন করতে চেয়েছিল একটি জাতির সত্তাকে, একটি জাতির বোঝার শক্তিকে, দেখার দৃষ্টিকে, অনুভব করার ক্ষমতাকে, একটি জাতির বিবেককে। তাদের খুনের আহাজারি একটি দুটি দশটি এক শটি পরিবারে ওঠেনি, উঠেছে বাংলাদেশজুড়ে। বদর বাহিনীর লোকেরা ঘৃণ্য অপরাধীমাত্র নয়, তারা নিকৃষ্টতম পাপী।

পাঞ্জাবিরা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে চাইবে এটা বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না। বুদ্ধিজীবীরা থাকলে তাঁদের চেঁচামেচিতে পাঞ্জাবিদের পক্ষে বাংলাদেশকে শোষণ করতে বিঘ্ন ঘটে, তাই এই শত্রুকে তারা নির্মূল করতে চাইবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি তরুণ কেন হত্যা করতে গেল বাংলাদেশের সেরা সেরা মানুষকে?

গেল এই জন্য যে এই তরুণেরা সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ ছিল না। এরা ছিল অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত। আর এই রোগ কোনো নতুন রোগ নয়। বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির এবং তার বোধ অনুভব-উপলব্ধি বিস্তৃত এলাকাজুড়ে খুনি আলবদরদের গোপন তৎপরতা আজকের ব্যাপার নয়। গুপ্তহত্যার কাজ তারা অনেক দিন ধরে করছিল। তারা মানুষ হত্যা করেনি হয়তো, কিন্তু হত্যা করতে চেয়েছে মানুষের মুখের ভাষাকে, সাহিত্যকে, সংগীতকে, অগ্রগতির ইচ্ছাকে, প্রগতিশীলতার আস্থাকে। তাদের সেই গোপন তৎপরতারই নগ্নতম, চরমতম ও নৃশংসতম প্রকাশ ঘটেছে তাদের অন্তিম মুহূর্তে। হানাদার সামরিক বাহিনী ৩০ লাখ মানুষ হত্যা করেছে, আলবদররা হত্যা করেছে কয়েক শ বুদ্ধিজীবী। উদ্দেশ্য একই, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করে দেওয়া। তফাত এই যে হানাদাররা জানত বাঙালিরা স্বাধীনতার জন্যই লড়ছে, আলবদররা কল্পনা করত যে স্বাধীনতা বুদ্ধিজীবীরা চাইছে, সে স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে পরাধীনতা। কার হাতে? ইসলামবিরোধী শক্তির হাতে।

আলবদররা হঠাৎ করে আকাশ থেকে নামেনি। এই দেশের মাটিতেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে এই অসুস্থ-বিকারগ্রস্ত ঘাতকেরা তৈরি হয়েছে, তাদের ছুরি শাণিয়েছে, গুপ্তহত্যার জন্য হাত তুলেছে। দেশের নিহত বুদ্ধিজীবীদের কথা যখন আমরা স্মরণ করব, তখন যে রোগের নাম আলবদর তার কথাও আমাদের

স্মরণ করতে হবে, চিনে নিতে হবে তার লক্ষণ ও বীজাণুগুলোকে, নইলে হয়তো আবার তারা আমাদের ক্ষতি করবে, যেমন করেছে হানাদারদের পলায়নের শেষ মুহূর্তে।
এটা জানা গেছে যে আলবদরদের অনেকেই ছিল মাদ্রাসার ছাত্র। মাদ্রাসা শিক্ষা যে অর্থহীন এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন, কিন্তু কেবল অর্থহীন নয়; এ শিক্ষা যে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনকও বটে—এই সত্যটা নাটকীয়ভাবে উন্মোচিত হয়েছে বদর বাহিনীর কীর্তির মধ্য দিয়ে। কিন্তু কিছু মাদ্রাসার ছাত্রের একার পক্ষে এই কাজ কখনো সম্ভবপর হতো না। আলবদরদের একমাত্র জোর ছিল সামরিক বাহিনীর জোর, সেই জোর না থাকলে কোনো সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার প্রয়োজন হতো না, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষই এদের শায়েস্তা করে ফেলত। কিন্তু হানাদার সামরিক বাহিনী তো ছিল রাজাকারদের পেছনেও, তবু রাজাকাররা তো আলবদরদের মতো কাজ করতে পারেনি কোথাও? আসলে আলবদররা প্রস্তুত ছিল এই বাংলাদেশেই; প্রস্তুত হয়ে ছিল, সামরিক বাহিনী ইশারা করামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়েছে অস্ত্র নিয়ে, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোর মধ্যে যাঁকেই হাতের কাছে পেয়েছে, তাঁকেই ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। তাদের ট্রেনিং ১৯৭১ সালের মে কিংবা জুন মাসে শুরু হয়নি। অতি প্রকাশ্যে এবং মহোৎসাহে ট্রেনিং শুরু হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারও আগে। ট্রেনিং পাঞ্জাবিরা দেয়নি, এই দেশের লোকেরাই দিয়েছে, শিক্ষিত লোকেরা, সমাজের শীর্ষে অধিষ্ঠিত লোকেরা। যেমন ধরা যাক ফরিদ আহমদের কথা। ফরিদ আহমদ বাংলাদেশে একজন ছিল না, ফরিদ আহমদ অনেক ছিল, নানা জায়গায় ছিল, ছিল রাজনীতিতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, প্রচারের মাধ্যমগুলোতে, ছিল অতিশয় সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে। ফরিদ আহমদ শুনেছি ইংরেজি সাহিত্যের ভালো ছাত্র ছিলেন, ভালো খেলোয়াড় ছিলেন, ছিলেন ভালো বক্তা। কিন্তু ফরিদ আহমদের সব আধুনিকতার অন্তরালবর্তী প্রকৃত মানুষ যেটি, সেটি একটি বিকারগ্রস্ত বিকৃতমনা পঙ্গু কাঠমোল্লা। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এই কাঠমোল্লার বিসদৃশ উল্লম্ফন ও কর্কশ চিৎকার থেকে থেকে বারবার শোনা গেছে। এই কাঠমোল্লাই কখনো জানিয়েছে যে বাংলা ভাষা পৌত্তলিক, কখনো বলেছে নজরুল ইসলাম ঘোরতর কাফের, বলেছে পয়লা বৈশাখ পালন করা মানে মুসলমানত্বের সর্বনাশ করা, বলেছে শহীদ মিনারের সামনে আলপনা আঁকলে আমরা হিন্দুদের ক্রীতদাস হয়ে পড়ব। বহু শতাব্দী ধরে প্রকৃতির হাতে, বিদেশিদের হাতে আমাদের বন্দিত্বের কদর্য গ্লানি, দারিদ্র্যের হাতে আমাদের সুকঠোর লাঞ্ছনা, যুগ-যুগান্তরে অনড় অন্ধকারের মধ্যে লালিত কুসংস্কার, আমাদের জীবনে শোচনীয় আনন্দহীনতা, অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুসলিম মধ্যবিত্তের অপারগতা ইত্যাকার সকল প্রকার বিকৃতির দ্বারা ওই কাঠমোল্লা গঠিত। আলবদররা ট্রেনিং পেয়েছে এই খর্বাকৃতির কাঠমোল্লার হাতে।
ফরিদ আহমদের আধুনিকতা ও ধর্মান্ধতার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, তারা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আর সেই মুদ্রাটি হচ্ছে বাংলাদেশের জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা। সন্দেহ নেই, এদের পূর্বপুরুষেরাই একদিন বড়াই করত আরব দেশ থেকে এসেছে বলে। বলত, বাংলা নয়, উর্দু হচ্ছে তাদের মাতৃভাষা। পরে এরা ইংরেজি শিখেছে। সেও ওই একই কারণে, নিজেদের আভিজাত্যকে কায়েমি করে রাখার অভিপ্রায়ে। পাকিস্তান আমলে উর্দু ভাষাভাষীদের সঙ্গে দহরম-মহরম করেছে। তাতে একদিকে নগদ অর্থ লাভ ঘটেছে, অন্যদিকে ক্ষমতাবানদের গৌরব থেকে কিছুটা এসে ছিটকে লেগেছে নিজেদের গায়ে। এবং উভয় দিক থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে তাদের দূরত্ব অর্থাৎ আভিজাত্য।
এরা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল সমাজের শীর্ষে। সেই শীর্ষ দেশ থেকে নিজেদের এরা জাহির করেছে সমগ্র দেশের পক্ষে অনুকরণীয় আদর্শ বলে—করেছে একাধিক কারণে। একটা কারণ এই যে এরা শিক্ষিত ছিল আলবদরের শিক্ষায়। এদের জীবনে আধুনিকতা যেটুকু তা বাইরের ব্যাপার, ব্যাপার জামাকাপড়, আসবাবপত্রের, বড়জোর বই থেকে মুখস্থ বলার ক্ষমতার। ভেতরে এরা অশিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়েও অন্ধকারাচ্ছন্ন। দ্বিতীয় কারণ হলো ভয়। নতুন যুগ যে এসেছে, সেটা এরা জানত, কিন্তু নতুন যুগকে জায়গা করে দিতে এদের ভীষণ ভয়, কেননা নতুন যুগ এলে এদের প্রতিষ্ঠা কেড়ে নেবে, আভিজাত্য দেবে নষ্ট করে আর ভয় এই যে নতুন যুগের শিক্ষা হয়তো তাদের অতীন্দ্রিয় আজন্ম লালিত ধ্যানধারণা ও শিক্ষাকে একেবারে মিথ্যা করে দেবে। সেই জন্য নতুন যুগের প্রবেশপথে এরা পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নিজেদের অভিলাষের মধ্যে ধারণা করেছে যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তথা সমাজতান্ত্রিক চেতনা নিয়ে প্রগতিশীলতার যে নতুন যুগ আসছে, সে কিছুতেই জিতবে না।
দেশের অধিকাংশ মানুষ এদের প্রচার-প্রচারণায় কোনো প্রকার আস্থা রাখেনি। নতুন কালকে তারা স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু ওই প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যকলাপ একেবারে বৃথা যায়নি। এদের কাজের মধ্য দিয়েই রোগের বীজাণু সৃষ্টি হয়েছে সেই বীজাণু, যা থেকে জন্ম হয় আলবদররা।
এতটা হতো না যদি না এরা পরিপোষকতা পেত দুটো শক্তির কাছ থেকে। তার একটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাচীন অন্ধকার, অন্যটা এই দেশের বিদেশি শাসক। বাংলাদেশের অন্ধকার শুধু অজ্ঞানতার নয়, অন্ধকার দারিদ্র্যের, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার, উৎপাদনের সামান্যতার। দীনতা এ দেশের মানুষকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসী করে তুলেছে, করে তুলেছে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু। তার প্রমাণ পাই সাম্প্রদায়িকতায়, পাই গণতন্ত্রের

অনুপস্থিতিতে। দুর্বল ও হতাশ মানুষের পক্ষে আত্মবিশ্বাস থাকার কথা নয়, আমাদের জাগতিক ব্যর্থতা আমাদের হীনমন্য করে তুলেছে, আমরা দৈবে আস্থা রেখেছি এবং ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির মধ্যে ব্যাখ্যা পেয়েছি নিজেদের জীবনের সর্ববিস্তারি দৈন্যের। প্রকৃতিকে জয় করা হয়নি, তাই প্রকৃতি থেকে আলাদা করে রাখতে চেয়েছি আমরা নিজেদের, দূরদেশবর্তী অতীতের সুখকল্পনার সাহায্যে। সেই জন্য ধর্মান্ধতা এসেছে, এসেছে নতুন যুগের মূল্যবোধের প্রতি অবিশ্বাস। এসেছে এই বিশ্বাস যে সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্মহীনতা।

শিক্ষার সাহায্যে এই রোগের চিকিৎসা হতে পারত। কিন্তু বাংলাদেশের বিদেশি শাসকেরা যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য রোগ সারানো ছিল না, ছিল রোগ বাড়ানো। তার ফলে দেখেছি বড় ডাক্তার গলায় তাবিজ না ঝুলিয়ে স্বস্তি পাচ্ছেন না, বড় ইঞ্জিনিয়ার তাবলিগের কাজে ব্যস্ত থাকছেন। দেখেছি যে কবি একদিন লাশ ও ডাহুকের মতো কবিতা লিখেছিলেন, তিনিই মগ্ন হয়েছেন হায়াত দারাজ খানের পদাবলি রচনায়। অত্যাধুনিক শিক্ষা ও মাদ্রাসার মধ্যে যোগাযোগ শুধু ফরিদ আহমদের জীবনেই ঘটেনি, এ দুইয়ের মধ্যে আসলেই একটা স্বভাবগত ঐক্য আছে। ঐক্য আছে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতায়, আনন্দহীনতায়, সম্পদ উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীনতায়। উভয় ব্যবস্থাই শাসকেরা সৃষ্টি করেছে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে।

আরও কাজ করেছে শাসকেরা। তারা সক্রিয় সমর্থন দিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে, পুরস্কার দিয়েছে ওই রোগে ভোগা মানুষদের। অসুখকে তারা সুখ বলে, বন্ধনকে তারা ভালো বলে মেনে নিতে প্ররোচনা দিয়েছে। বিরুদ্ধ মতের প্রতি হুমকি দিয়েছে প্রকাশ্যে। ফলে আলবদররা আরও পুষ্ট হয়ে উঠেছে দিনকে দিন। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে আলবদররা প্রকাশ্যে মানুষ খুনের কাজে লিপ্ত হতে পারত না কিছুতেই।

এরা এখন পালিয়েছে। কিন্তু যে রোগের নাম আলবদর, সেটা এত সহজে শেষ হবে মনে করলে আমরা মস্ত বড় ভুল করব। রোগটা শক্ত, তার বয়স অনেক, তার চিকিৎসা হয়নি পুরোপুরি। কাজেই আপাতত তাকে না দেখা গেলেও সে আছে। যদি প্রশ্রয় পায়, সে বাড়বে; যদি সুযোগ পায়, আবার সে আক্রমণ করবে বাংলাদেশের বিবেককে, তার বোঝার শক্তিকে, দেখার দৃষ্টিকে, অনুভব করার ক্ষমতাকে।

এই রোগকে যদি আমরা নির্মূল না করি, যদি ধ্বংস না করে দিই এর বীজাণু এবং ব্যবস্থা না নিই যাতে এরা না জন্মে আর কখনো, তবে শুধু যে ব্যর্থ যাবে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু তা-ই নয়, মৃত্যু আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না, ভবিষ্যতে হয়তো আবার রক্তের নদী বইবে, আবার ব্যাপক ধ্বংস আসবে জীবনে।

রোগটা, পুনরায় স্মরণ করা যাক, শুধু ধর্মান্ধতা নয়, রোগটার নাম আদর্শগত প্রতিক্রিয়াশীলতা।

দৈনিক বাংলা, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১ পৌষ ১৩৭৯

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: লেখক ও ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একটি ফুলকে বাঁচাব বলে

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি' গানটি দারুণভাবে প্রেরণা জুগিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের। এই কালজয়ী গানের রচয়িতার আত্মস্মৃতি একটি ফুলকে বাঁচাব বলে: মুক্তিযুদ্ধের এই ঐতিহাসিক গানের ইতিকথা অচিরেই বের হবে প্রথমা প্রকাশন থেকে। সে বইয়ের নির্বাচিত অংশ

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে একদিন সন্ধ্যার পর পার্ক সার্কাসে বন্ধুবর সংগীতশিল্পী বাচ্চু রহমানের বাসায় গিয়েছি। উদ্দেশ্য তার সঙ্গে দেখা করা। সেখানে হঠাৎ কামাল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। কামাল ভাই যে কলকাতায় আছেন, তা জানতাম না। ভেবেছিলাম, তিনি ঢাকায়। তাই তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম। আমাকে দেখে কামাল ভাই ব্যগ্রভাবে বলে উঠলেন, 'তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে। বাংলাদেশের এই পরিস্থিতির ওপর তুমি শিগগিরই আমাকে কিছু জোরালো গান লিখে দাও। দেরি কোরো না। পারো তো এক সপ্তাহের মধ্যে লিখে দিতে পারলে ভালো হয়।' বললাম, 'অত তাড়াতাড়ি কী হবে? তবে চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি আপনাকে লিখে দিতে পারি। কতগুলো গান আপনি চান?' তিনি বললেন, 'অন্তত কুড়ি-পঁচিশটা গান একটা খাতায় ভালো করে লিখে খাতাটা আমাকে দিয়ে দেবে।'

যত দূর মনে পড়ছে, এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে আমি প্রথমে পনেরোটি গানসংবলিত ছোট একটা এক্সারসাইজ বুক বা খাতা কামাল ভাইয়ের হাতে তুলে দিই।
তিনি সব কটা গানই খুব মনোযোগ দিয়ে কয়েকবার পড়ে নিলেন। তারপর পাকা জহুরির মতো 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি' গানটিকেই খাতার সেরা গান বলে রায় দিলেন।
তাঁর সঙ্গে আমার প্রথমে যে কথা হয়েছিল, তাতে ঠিক করা হয়েছিল যে তিনি খুব ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত কাউকে দিয়ে গানের খাতাটা বাংলাদেশের ভেতরে 'স্বাধীন বাংলা বেতারের' শিল্পীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু পরে তিনি মত পরিবর্তন করলেন। কেননা, বাংলাদেশের ভেতরে সেদিনকার প্রতি মুহূর্তের অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে হাতে লেখা গানের খাতা কাউকে দিয়ে পাঠানো তিনি নিরাপদ মনে করেননি। আলোচনার পর ঠিক হলো, খাতার গানগুলো 'জয় বাংলার গান' নাম দিয়ে একটা ছোট পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে তার কিছু বাংলাদেশের ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে কামাল ভাই তাঁর পরিচিত একজন প্রকাশকের সঙ্গে কথাবার্তাও প্রায় পাকা করে ফেললেন। প্রকাশক ভদ্রলোক গানের পুস্তিকাটি প্রকাশ করার নিশ্চিত কথা দিয়েও ক্রমাগত টালবাহানা করতে লাগলেন। এভাবে কিছুদিন নষ্ট হলো। শুধু সময়ই নষ্ট হলো না, সেই ডামাডোলের মধ্যে গানের খাতাটাও খোয়া গেল। গভীর হতাশায় মনটা আমার ভরে গেল।

'স্বাধীন বাংলা বেতারের' ঠিকানাও তখন অনিশ্চিত। আগরতলা ছাড়ার পর ভ্রাম্যমাণ ট্রাকেই তখন তার সাময়িক অবস্থান। ফলে, গানের বই ছাপিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে 'স্বাধীন বাংলা বেতারে' পাঠানোর পরিকল্পনা ছাড়তে হলো। তবু, কামাল ভাইয়ের ডেরায় বাড়ি ফেরার পথে মাঝেমধ্যে হাজিরা দিই। বাচ্চুও অফিস ছুটি শেষে কোনো কোনো দিন আসে। নানা গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনা হয়। নতুন গান লেখার কথাও হয়। কামাল ভাই হতাশ হতে নিষেধ করেন।
এরই মধ্যে কামাল ভাই হঠাৎ একদিন আমাকে গানগুলো আবারও একটা খাতায় কপি করে দেওয়ার জন্য বললেন। কারণ কিছুই খুলে বললেন না। কামাল ভাইকে দ্বিতীয়বার যখন গানের খাতা দিই, সময়টা তখন মে মাসের মাঝামাঝি কি মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হবে। দেখা হলে মাঝেমধ্যে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'কী করলেন গানগুলো নিয়ে?' তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেন না, শুধু জবাব দেন, 'পরে বলব।' আমার মনে কৌতূহল দুর্নিবার হয়ে ওঠে, কিন্তু বাধ্য হয়েই তা দমন করতে হয়।
জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই কামাল ভাই আমাকে প্রথম জানালেন যে আমার গানের খাতাটি তিনি 'স্বাধীন বাংলা বেতারে' পৌঁছে দিয়েছেন। আমার কয়েকটি গানে সুর হচ্ছে। দুজন সুর করছেন। তখন আর বিস্তারিত কিছু বললেন না। আমিও এ বিষয়ে আর কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলাম না। তিনি আমাকে গানগুলোর আর একটা 'কপি' করে দিতে বললেন। কেননা, যে দুজন আমার গান সুর করছেন—একটা খাতা হওয়ায় তাঁদের দুজনেরই কাজে খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমি পরদিনই আর একটি খাতায় গানগুলো 'কপি' করে তাঁকে দিয়ে দিলাম। এ ব্যাপারে যে বিস্তারিত তথ্য আমি পরে তাঁর মুখ থেকে শুনেছিলাম তা নিম্নরূপ—
মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে 'স্বাধীন বাংলা বেতারের' গোপন কেন্দ্র একরকম পাকাপাকিভাবে স্থাপিত হয়ে যায় কলকাতায়। কর্মকর্তাদের অন্যতম প্রধান এবং বেতারের সংবাদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিখ্যাত সাংবাদিক কামাল লোহানী সাহেব ছিলেন কামাল ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফলে, লোহানী সাহেব কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই কামাল ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের গোপন কেন্দ্রে নানা কর্মসূত্রে তাঁর যাতায়াত শুরু হয়ে যায়। অনুষ্ঠান প্রচারের প্রথম যুগে ভালো গানের অভাবের কথা শুনে তিনি আমার গানের খাতাটি লোহানী সাহেবের হাতে তুলে দেন। লোহানী সাহেব তখন খাতাটি বেতারের সংশ্লিষ্ট সুরকারদের দেন খাতা থেকে গান বাছাই করে সুর করা এবং তা প্রচার করার জন্য। খাতার 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি' গানটির কথা লোহানী সাহেবেরও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গানটির যাতে ভালো সুর হয়, সে জন্য দুই বন্ধুতে পরামর্শ করে লোহানী সাহেব প্রথম আমার গানের খাতাটি বেতারের বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ সুরকার ও সংগীত স্রষ্টা সমর দাস মহাশয়কে দেন। কিন্তু আপেল মাহমুদ নামে বেতারের একজন তরুণ সংগীতশিল্পী খাতা থেকে ওই গানটি পছন্দ করে বেছে নিয়ে সুর করতে আরম্ভ করেন। আপেল মাহমুদ অভিজ্ঞ সুরকার না হওয়ায় তাঁর দেওয়া সুর কেমন হবে, এ বিষয়ে লোহানী সাহেব ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গানটিতে ইচ্ছামতো সুর করার জন্য তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সে সময় স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পী ও সুরকাররা নিজেদের মধ্যে সব সময় আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করে মিলেমিশে কাজ করতেন। ফলে, অনেক নতুন শিল্পীকেও পরীক্ষামূলকভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে স্বাধীনতা দেওয়া হতো।
যা-ই হোক, আপেল মাহমুদ তো অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি'

গানটির সুর করে ফেললেন। সুর করে তিনি লোহানী সাহেব ও অন্যদের শোনালেন। একদিন কামাল ভাইকে ডেকে নিয়ে গিয়েও গানটি তাঁকে শোনানো হলো। সবাই মোটামুটি তাঁর সুর পছন্দ করলেন। গানটিতে তিনি ভালো সুর দিয়েছেন বলেও অভিমত প্রকাশ করলেন তাঁরা। এরপর আপেল গানটি রেকর্ড করেন এবং স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে তাঁর কণ্ঠেই গানটির প্রচার শুরু হয়। আমার যত দূর স্মরণে আসছে, তাতে ১৯৭১-এর জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে গানটি প্রথম 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে প্রচার করা হয়। কারণ, নির্দিষ্ট দিন ও তারিখ মনে না থাকলেও এটুকু মনে আছে যে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই আমি গানটি প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে শুনেছিলাম। কেননা, স্বাধীন বাংলা বেতারের দেশাত্মবোধক সংগীতের অনুষ্ঠান সে সময় আমি নিয়মিত দুই বেলাই শুনতাম। বিশেষ করে, আমার গানগুলো স্বাধীন বাংলা বেতারে দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি গানে সুর দেওয়া হচ্ছে—কামাল ভাইয়ের মুখে এ কথা শোনার পর আরও বেশি আগ্রহ নিয়ে বেতারের অনুষ্ঠান শুনতাম।

'স্বাধীন বাংলা বেতার' থেকে গানটি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বিরাট সাড়া পড়ে গেল। বাংলার মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, প্রতিটি ঘর, মুক্তিযোদ্ধাদের শিবির—সর্বত্র অনুরণিত হয়ে। ফিরতে লাগল এই গানের সুর। তরুণ আপেল মাহমুদ রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। শুধু বাংলাদেশের মানুষের মনেই নয়, স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পীদের মধ্যেও তিনি হয়ে উঠলেন 'হিরো'। আমার ভূমিকা রইল নেপথ্যে। মুষ্টিমেয় দু-তিনজন ছাড়া বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি মানুষের কেউ জানল না গানটির প্রকৃত স্রষ্টা কে? কারণ, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে প্রচারিত কোনো দেশাত্মবোধক গানের রচয়িতার নাম তখন ঘোষণা করা হতো না। সেই জরুরি অবস্থায় তখন তা সম্ভবও ছিল না।

গোবিন্দ হালদার: পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত গীতিকার

লাঞ্ছনার বীভৎস দৃশ্য

আমি ১৯৬১ সাল থেকে ঢাকা পৌরসভার অধীনে সুইপার ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ আমি আমার সুইপারের দল নিয়ে দায়িত্ব পালন করে সন্ধ্যায় ৪৫/১, প্রসন্ন পোদ্দার লেনে আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। রাত নয়টার দিকে আমি ঢাকা ইংলিশ রোডের দিকে বের হয়ে দেখলাম, রাস্তাঘাট চারদিকে থমথমে, সব ধরনের যানবাহনকে দ্রুত গন্তব্যস্থলের দিকে যেতে দেখলাম। ছাত্র-জনতাকে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করতে দেখলাম। প্রতিরোধ তৈরিতে ব্যস্ত ছাত্র-জনতার কাছে জানতে পারলাম, ঢাকা সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি সেনারা রাজধানী ঢাকার দিকে সামরিক ট্রাক নিয়ে এগিয়ে আসছে। পাকিস্তানি পশুদের প্রতিরোধ করার জন্য ছাত্র-জনতার এ প্রচেষ্টা ও প্রয়াস। আমি সবকিছু দেখে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বাসায় চলে গেলাম। রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, পুলিশ অফিস ও মালিবাগ, গোয়েন্দা অফিসের দিকে আকাশফাটা গোলাগুলির ভীষণ গর্জন শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলাম, রাজধানীর উত্তরে বস্তি এলাকা জ্বলছে। রাজারবাগ থেকে গোলাগুলির শব্দ শোনার সময় ঢাকা শাঁখারীবাজার প্রবেশপথে বাবুবাজার ফাঁড়িতে ভীষণ শেলিংয়ের গর্জন শুনলাম। আমি নিকটবর্তী নয়াবাজার সুইপার কলোনির দোতলায় দাঁড়িয়ে চারদিকে গোলাগুলির ভীষণ গর্জন শুনলাম।

২৬ মার্চ প্রত্যুষে আমি সুইপার কলোনির দোতলা থেকে দৌড়ে নেমে বাবুবাজার ফাঁড়িতে গিয়ে দেখলাম ফাঁড়ির প্রবেশপথ, ভেতরে, চেয়ারে বসে, উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ১০ জন পুলিশের ইউনিফর্ম পরা গুলির আঘাতে ঝাঁজরা ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। আমি ফাঁড়ির ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম ফাঁড়ির চারদিকের দেয়াল হাজারো গুলির আঘাতে ঝাঁজরা হয়ে আছে। দেয়ালের চারদিকে মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত, তাজা রক্ত জমাট হয়ে আছে, দেখলাম কেউ জিব বের করে পড়ে আছে, কেউ হাত-পা টানা দিয়ে আছে, প্রতিটি লাশের পবিত্র দেহে অসংখ্য গুলির আঘাত। মানবতার অবমাননা ও লাঞ্ছনার বীভৎস দৃশ্য দেখে আমি একটি ঠেলাগাড়িতে করে সব লাশ ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘরে রেখে আবার ঠেলাগাড়ি নিয়ে শাঁখারীবাজারে প্রবেশ করে একেবারে পূর্বদিকে ঢাকা জজকোর্টের কোণে হোটেল-সংলগ্ন রাস্তায় ১০টি ফকির-মিসকিন ও রিকশার মেরামতকারী মিস্ত্রির উলঙ্গ ও অর্ধ-উলঙ্গ লাশ ওঠালাম। কোনো হিন্দুর লাশ আমি রাস্তায় পাইনি। সব কটি লাশ মুসলমানের ছিল। রাস্তায় পড়ে থাকা গুলিতে ঝাঁজরা ১০টি লাশ ঠেলাগাড়িতে তুলে আমি মিটফোর্ড নিয়ে গিয়েছি। মুসলমানদের লাশ এভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেওয়া যায় না। তাই আমরা স্থানীয় ছাত্র-জনতা সবাই মিলে লাশগুলো তুলে মিটফোর্ডে জমা করেছি।

রাজধানীতে ছাত্র-জনতা রাস্তায় রাস্তায় বের হয়ে পড়লে পাকিস্তানি সেনারা ঘোষণা করে, ঢাকায় কারফিউ বলবৎ রয়েছে, কেউ রাস্তায় বের হলে গুলি করা হবে। পাকিস্তানি সেনাদের এ ঘোষণার পর আমরা সরে পড়লাম। দিনের শেষে বিকেল পাঁচটার সময় তাঁতিবাজার, শাঁখারীবাজার ও কোর্ট হাউস স্ট্রিট এলাকায় পাকিস্তানি সেনারা আগুন ধরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে বৃষ্টির মতো অবিরাম গুলিবর্ষণ। সারা রাত

পাকিস্তানি সেনারা তাঁতিবাজার, শাঁখারীবাজার ও গোয়ালনগর এলাকায় অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ বেলা একটার সময় পাকিস্তানি সেনারা নবাবপুর থেকে ইংলিশ রোডের বাণিজ্য এলাকার রাস্তার দুই দিকের সব দোকানপাটে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেলা তিনটা পর্যন্ত ইংলিশ রোডের রাস্তার দুই দিকে আগুন জ্বলতে থাকে। আগুনের সেই লেলিহান শিখায় পার্শ্ববর্তী এলাকার জনতা আশ্রয়ের জন্য পালাতে থাকে। পালাতে গিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের গুলির আঘাতে অনেকে প্রাণ হারায়। বেলা তিনটায় পাকিস্তানি সেনারা তাঁতিবাজারের বাহির পথ ও মালিবাগের পুলের পশ্চিম পাশে হিন্দু মন্দিরের ওপর শেলিং করে মন্দিরটি ধ্বংস করে দেয়।
ইংলিশ রোডের আগুন বাসাবো এলাকা অতিক্রম করে সুইপার কলোনির দিকে ধেয়ে আসতে থাকলে আমি সুইপারদের কলোনির পানি রিজার্ভ করে রাখার নির্দেশ দিই। পাকিস্তানি সেনাদের ডিঙিয়ে সব সুইপার মিলে সুইপার কলোনিটি রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হলে আমরা পাকিস্তানি সেনাদের গুলির মুখে চলে আসি। ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ সকালে রেডিও মারফত সব সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীকে অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে, এ নির্দেশ পেয়ে পরদিন আমি সকাল ১০টার সময় ঢাকা পৌরসভায় ডিউটি রিপোর্ট করলে ঢাকা পৌরসভার তৎকালীন কনজারভেন্সি অফিসার ইদ্রিস আমাকে ডোম নিয়ে অবিলম্বে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা লাশ তুলে ফেলতে বলেন। ইদ্রিস সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলতে থাকেন, সাহেব আলী, বের হয়ে পড়ো, যদি বাঁচতে চাও, তবে ঢাকার রাজপথ ও বিভিন্ন এলাকা থেকে লাশ তোলার জন্য বের হয়ে পড়ো। কেউ বাঁচবে না, কাউকে রাখা হবে না, সবাইকে পাক সেনাদের গুলিবর্ষণে মরতে হবে, সবাইকে কুকুরের মতো হত্যা করা হবে। পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মেজর সালামত আলী খান শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে কুকুরের মতো উত্তেজিত হয়ে, অত্যন্ত কর্কশ স্বরে ক্রুদ্ধভাবে বকাবকি করতে থাকেন। সেখানে আমি, সুইপার ইন্সপেক্টর আলাউদ্দিন, সুইপার ইন্সপেক্টর কালীচরণ, সুইপার সুপারভাইজার পাঞ্চাম, সুইপার ইন্সপেক্টর আওলাদ হোসেন—আমরা পাঁচজন উপস্থিত ছিলাম। আমাকে পরদেশি ডোম, মন্টু ডোম, লেমু ডোম, ডোম গোলাপ চান, দুঘিলা ও মধু ডোমকে নিয়ে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে লাশ তুলে স্বামীবাগ আউটকলে ফেলতে বলা হয়।
১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ আমার দল ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘর থেকে দুই ট্রাক লাশ তুলেছে। আমার দল যেসব লাশ তুলেছে, আমি স্বচক্ষে তা দেখেছি। অধিকাংশই ছিল সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, আনসার ও পাওয়ারম্যানদের খাকি পোশাক পরা বিকৃত লাশ। লাশ তুলতে তুলতে পরদেশি নামে আমার জনৈক ডোমের হাতে এক ষোড়শী রূপসীর উলঙ্গ ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখলাম, দেখলাম সেই যুবতীর পবিত্র দেহে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন, তাঁর বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে, লজ্জাস্থান ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, পেছনের মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে। হরিণের মতো মায়াভরা মধুময় বড় বড় চোখ ঘুমিয়ে আছে, সারা দেহে সৃষ্টিকর্তা যেন দুধের সর দিয়ে আবৃত করে দিয়েছেন, মাথায় কালো কালো চুল তাঁর কোমর পর্যন্ত লম্বা হয়ে পড়েছিল, তাঁর দুই গালে আঘাতের চিহ্ন দেখলাম। পরক্ষণেই দেখলাম ১০ বছরের এক কিশোরীর উলঙ্গ ক্ষতবিক্ষত লাশ। অপরূপা রূপসী ফলের মতো টকটকে চেহারা, সারা দেহে বুলেটের আঘাত। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল থেকে ভারপ্রাপ্ত পাকিস্তানি সেনাদের মেজর পৌরসভায় টেলিফোনে সংবাদ দেন রোকেয়া হলের চারদিকে মানুষের লাশের পচা গন্ধে সেখানে বসা যাচ্ছে না, অবিলম্বে ডোম পাঠিয়ে লাশ তুলে ফেলা হোক।
আমি ছয়জন ডোম নিয়ে রোকেয়া হলে প্রবেশ করে রোকেয়া হলের সব কক্ষে তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোনো লাশ না পেয়ে চারতলার ছাদের ওপর গিয়ে ১৮ বছরের জনৈক রূপসী ছাত্রীর উলঙ্গ লাশ দেখতে পেলাম। আমার সঙ্গে দায়িত্বরত জনৈক পাকিস্তানি সেনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ছাত্রীর দেহে গুলির কোনো আঘাত নেই, দেহের কোনো স্থানে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই অথচ মরে চিত হয়ে পড়ে আছে কেন? সে অট্টহাসিতে

ফেটে পড়ে বলল, আমরা সব পাকিস্তানি সেনা মিলে ওকে ধর্ষণ করতে করতে মেরেছি। পচা-ফোলা সেই রূপসীর উলঙ্গ দেহ পড়ে আছে দেখলাম। ডাগর ডাগর চোখ ফুলে বের হয়ে আছে, মাথার চুল কাছেই ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, লজ্জাস্থান তার পেট থেকে ফুলে অনেক ওপরে উঠে আছে, যোনিপথ রক্তাক্ত। তার দুই দিকের গালে পশুদের কামড়ের চিহ্ন দেখলাম, বক্ষের স্তনে মানুষের দাঁতের দংশনের চিহ্ন দেখলাম। আমি একটি চাদর দিয়ে লাশটি ঢেকে দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসি। রোকেয়া হলের সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের ভেতরে প্রবেশ করে পাঁচজন মালির স্ত্রী-পরিজনদের পাঁচটি লাশ এবং আটটা পুরুষের লাশ (মালি) পেয়েছি। লাশ দেখে মনে হলো মৃত্যুর আগে সবাই শুয়ে ছিল। আমি ট্রাক নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিববাড়ির তেতলা থেকে জনৈক হিন্দু অধ্যাপক, তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলের লাশ তুলেছি।
স্থানীয় জনতার মুখে জানতে পারলাম, তাঁর দুই মেয়ে বুলেটবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে আছেন। সংগৃহীত লাশ স্বামীবাগ আউটকলে ফেলে দিয়ে আমরা ট্রাক নিয়ে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে ভাসমান হাত-পা, চোখ বাঁধা অসংখ্য যুবকের লাশ তুলেছি। আমরা ৩০ মার্চ বুড়িগঙ্গা নদী থেকে তিন ট্রাক লাশ তুলে স্বামীবাগ ফেলেছি। পাকিস্তানি সেনারা কুলি দিয়ে আগেই সেখানে বিরাট বিরাট গর্ত করে রেখেছিল। পরের দিন আমরা মোহাম্মদপুর এলাকার জয়েন্ট কলোনির কাছ থেকে সাতটি পচা-ফোলা লাশ তুলেছি। ইকবাল হলে (সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) আমরা কোনো লাশ পাইনি। পাকিস্তানি সেনারা আগেই ইকবাল হলের লাশ পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। বস্তি এলাকা থেকে জগন্নাথ হলে আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসা ১০ জন নর-নারীর ক্ষতবিক্ষত লাশ তুলেছি।
ফেরার পথে আমরা ঢাকা হলের ভেতর থেকে চারজন ছাত্রের উলঙ্গ লাশ তুলেছি। ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল আমরা কচুক্ষেত, ড্রাম ফ্যাক্টরি, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, দ্বিতীয় রাজধানী এলাকার ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তর, ঢাকা স্টেডিয়ামের মসজিদের পূর্ব-দক্ষিণ দিক থেকে কয়েকজন ছাত্রের পচা লাশ তুলেছি। এরপর প্রতিদিন আমরা বুড়িগঙ্গা নদীর পাড় থেকে হাত-পা, চোখ বাঁধা অসংখ্য যুবকের লাশ তুলেছি। মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজের হল থেকে ১০ জন ছাত্রের ক্ষতবিক্ষত লাশ তুলেছি। রায়েরবাজার রাস্তা, পিলখানা, গণকটুলী, ধানমন্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান, এয়ারপোর্ট রোডের পার্শ্ববর্তী এলাকা, তেজগাঁও মাদ্রাসা থেকে অসংখ্য মানুষের পচা-ফোলা লাশ তুলেছি। অনেক লাশের হাত-পা পেয়েছি, মাথা পাইনি। মেয়েদের লাশ সবই উলঙ্গ ও ক্ষতবিক্ষত দেখেছি।
কিছুদিন পর আমি কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো কারখানায় গিয়ে সাধনা ঔষধালয়ের মালিক প্রফেসর যোগেশ চন্দ্রের বেয়নেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত তাজা লাশ তুলে স্বামীবাগ ফেলেছি। পাকিস্তানি পশুরা যোগেশ বাবুর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাঁকে তাঁর নিজস্ব কামরায় বক্ষে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে রেখে যায়। পরে তাঁর পবিত্র ক্ষতবিক্ষত লাশ নিচে নামিয়ে এনে খাটের ওপর রেখে দিয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম, যোগেশবাবুর লাশ জিব বের করে হাঁ করে আছে। গায়ে ছিল ধুতি আর গেঞ্জি।

স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র, খণ্ড ৮
সাহেব আলী: তৎকালীন সুইপার ইন্সপেক্টর, ঢাকা পৌরসভা, ঢাকা

নিয়াজির আর কোনো পথ ছিল না: অরোরা

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর ভারতীয় দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ভারত ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা ও লে. জেনারেল নিয়াজির সাক্ষাৎকারভিত্তিক দুটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই দুই প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে দুই অধিনায়কের তখনকার মানসিক অবস্থা

বিজয়ী সেনাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা শুক্রবার কলকাতায় বলেন, ঢাকায় কোনো যুদ্ধই হয়নি। গতকাল ঢাকায় যে যুদ্ধ আমি দেখে এসেছি তা হলো রমনা রেসকোর্সে নতিস্বীকারের শর্তাবলিসহ টাইপ করা একখানি কাগজের নিচে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজির সইয়ের সময় স্বাধীন বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষের উল্লাস। এই উল্লাস দেখলাম কলকাতাতেও। অরোরা যখন সাংবাদিক বৈঠক থেকে বের হন, জনতা চিৎকার দেয়, ‘অরোরা, জিন্দাবাদ।’

বেলা তখন ১১টা। ডালহৌসিতে পূর্বাঞ্চলের সামরিক বাহিনীর পিআরও অফিসের হলঘরটি দেশি-বিদেশি মিলিয়ে শ দুয়েক সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান ও টেলিভিশনের লোকজনে ঠাসা। জেনারেল অরোরা তাঁর ছোট্ট ছড়িখানা ঘোরাতে ঘোরাতে ঘরে ঢুকলেন। রিপোর্টার, ফটোগ্রাফাররা ঘন ঘন করতালি দিলেন। স্বাগত জানালেন বিজয়ী বীরকে। পাকিস্তানি বাহিনীর নতিস্বীকারের পর জেনারেল অরোরার এটাই ছিল প্রথম সাংবাদিক বৈঠক।

এদিন ঘরে ঢুকে দেখি, দুজন ক্যাপ্টেন দেয়ালের বড় মানচিত্রটির তিরচিহ্নগুলো তুলতে ব্যস্ত। একজন কর্নেল বললেন: আর ওগুলোর দরকার হবে না। গোটা বাংলাদেশ এখন হয়েছে মুক্ত।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন: জেনারেল, আপনি তো ঢাকা থেকে ঘুরে এলেন। ঢাকা পতনের কাহিনি কি সংক্ষেপে আমাদের কাছে বর্ণনা করবেন?

জেনারেল বললেন, যুদ্ধ না করেই ঢাকা আমাদের দখলে এসে গিয়েছে। আমরা পাকিস্তানি ফৌজকে পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিলাম। তাদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। ঢাকা কীভাবে দখল করা হলো এবং সমগ্র পূর্বখণ্ডে কী রণকৌশল অনুসৃত হয়েছিল তিনি তা ব্যাখ্যা করছিলেন।

রিপোর্টাররা একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন। জেনারেল খুব আস্তে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেন। একজন রিপোর্টার বলেন: জেনারেল আপনাকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, ‘আই অ্যাম অলওয়েজ ইন এ রিল্যাক্সিং মুড।’

জেনারেল বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধবন্দীদের ভারতে নিয়ে আসা হবে। শুধু যুদ্ধবন্দী নয়,

বাংলাদেশে যেসব পশ্চিম পাকিস্তানি আছে তারা দেশে ফিরে যেতে চাইলে তাদেরও যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। রাস্তাঘাট ঠিক হলেই যুদ্ধবন্দীদের এখানে নিয়ে আসার কাজ শুরু হবে।
জেনারেল বলেন, তেজগাঁও বিমানঘাঁটি থেকে হাজার হাজার মানুষের ভিড় ঠেলে গাড়িতে করে যাওয়ার সময় লে. জে. নিয়াজি তাঁকে বলেছেন যে বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর ৯৩ হাজার লোক আছে। তিনি বলেন, এটা নিয়াজির দাবি। তবে আমার ধারণা, ওই সংখ্যা ৭০ হাজারের বেশি হবে না। তবে বর্তমানে ঠিক কত আছে, তা আমি বলতে পারব না।
তিনি বলেন, নিয়াজি ও পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে নতিস্বীকারের ঠিক পরেই নিরস্ত্র করা হয়নি। তার কারণ নিরস্ত্র করা হলে সেখানকার উত্তেজিত জনতা এর বদলা নিত। জেনারেল বলেন, বাংলাদেশের উত্তেজিত জনতার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য জেনারেল নিয়াজিকে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়।
একজন বিদেশি সাংবাদিক জানতে চান, নিয়াজি কি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক? জেনারেল হেসে বলেন, ও ইয়েস। আমার সঙ্গে নিয়াজির ঢাকায় যেটুকু সময় কথা হয়েছে, তার মধ্যে অন্ততপক্ষে চার-পাঁচবার নিয়াজি বলেছেন: আমি আমার লাহোরে ফিরে যেতে চাই। লাহোর খুবই ভালো শহর। আমার স্ত্রী আর এখানে থাকতে চাইছে না।
ঢাকায় কেন যুদ্ধ করতে হয়নি? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে জেনারেল বলেন: আমরা যখন তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলেছি, তখন নিয়াজি ঠিকই করে ফেলেছিলেন যে যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। তা ছাড়া পাকিস্তানি ফৌজের মনোবলও ভেঙে পড়েছিল।
প্রশ্ন: আত্মসমর্পণের ব্যাপারে নিয়াজি কি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে পরামর্শ বা নির্দেশ চেয়েছিলেন।
জেনারেল: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কী পরামর্শ বা নির্দেশ দিয়েছিলেন জানি না। তবে নিয়াজির এ ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না।
জেনারেল বলেন: আমি আগেই আপনাদের কাছে বলেছিলাম যে বাংলাদেশের এই যুদ্ধ এক পক্ষকাল খুব বেশি হলে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে। কিন্তু ১২ দিনের মধ্যেই সবকিছু শেষ হয়ে গেল।
প্রশ্ন: পাকিস্তানি ফৌজের তো যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা লড়তে পারল না কেন?
জেনারেল: শুধু অস্ত্রশস্ত্র থাকলেই যুদ্ধ করা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা পাকিস্তানি ফৌজের কোনো মনোবল ছিল না। বড় বড় শহরকে বাদ দিয়ে আমরা যে ওদের চারদিক থেকে এভাবে ঘেরাও করে ফেলব, এটা নিয়াজি কখনো ভাবতে পারেননি। তার কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ নাগরিক ও শহর, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাতে কোনোরূপ ক্ষতি না হয়। এ জন্য আমরা কতকগুলো গ্রামের পথ কেটে ওদের আক্রমণ করি। পাকিস্তানি ফৌজকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আক্রমণ চালাই। আমরা জানি, পাকিস্তানি ফৌজ একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তারা আর কখনো আমাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠবে না। এবং তখন আত্মসমর্পণই হবে তাদের একমাত্র বাঁচার পথ। আমাদের জয়ের মূলে হলো এই সুপার স্ট্র্যাটেজি। ওরা ভেবেছিল, ভারতীয় জওয়ানরা বাংলাদেশের একের পর এক বড় বড় শহর ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু তাদের সেই স্ট্র্যাটেজি সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং পাকিস্তানি ফৌজের পরাজয়ের মূলে হলো তাদের এই ভুল স্ট্র্যাটেজি। তা ছাড়া ওদের 'ওভার অল প্ল্যানিংও' ত্রুটিপূর্ণ ছিল।
জেনারেল বলেন, ৮ ব্যাটালিয়ন মুক্তিবাহিনীও আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে লড়াই করেছে। বিদেশের কোনো কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে ঢাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৬ ব্যাটালিয়ন ছত্রীসেনা নেমেছে। এটা ঠিক নয়। এ পর্যন্ত একটি ব্যাটালিয়ন থেকে ৬০০ থেকে ৭০০ ছত্রীবাহিনী ঢাকায় ও ঢাকার আশপাশে নামানো হয়েছে।
জেনারেল বলেন, পাকিস্তানি ফৌজ নিজ নিজ হেডকোয়ার্টারে পালিয়ে যাওয়ার সময় নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক হলো, স্ত্রীলোকের ওপর নিয়াজির বাহিনী অকথ্য অত্যাচার

করেছে। জেনারেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, একাধিক বাংকারের মধ্যে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। বীভৎস দৃশ্য। তিনি বলেন, সভ্যজগতে কোনো সেনাবাহিনী যে স্ত্রীলোকের ওপর এরূপ পাশবিক অত্যাচার করতে পারে, এটা আমি ভাবতেও পারি না।

জেনারেল বলেন, খুলনা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এবং আরও কয়েকটি জায়গায় এখনো পাকিস্তানি ফৌজ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেনি। তার কারণ, তারা এখনো নিয়াজির বার্তা হয়তো পায়নি। তাঁর আশা, শনিবারের মধ্যেই বাংলাদেশে দখলদার ফৌজের আত্মসমর্পণ পর্বের সমাপ্তি ঘটবে।

প্রশ্ন: ভারত থেকে বাংলাদেশের শরণার্থীরা কবে নাগাদ আবার দেশে ফিরে যেতে পারবে?

জেনারেল বলেন, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তারা যেতে পারবে। এরই মধ্যে অনেকে যেতে শুরু করেছে।

একজন বিদেশি সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: ভারতীয় সেনাবাহিনী কত দিন স্বাধীন বাংলায় থাকবে?

জেনারেল: আইনশৃঙ্খলা ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেই ভারতীয় সেনাবাহিনী ওখান থেকে চলে আসবে। তার আগে সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে রাস্তাঘাট ও অন্যান্য ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সেখানকার সরকার বদ্ধপরিকর। প্রশাসনিক কাঠামোকে জোরদার করে তোলার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং তাঁর সহকর্মীরাও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের সাবেক গভর্নর ডা. মালিকের সঙ্গে আপনার ঢাকায় দেখা হয়েছিল?

জেনারেল: না, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে শুনেছি তিনি এখন ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন।

এই যুদ্ধে ভারতীয় নৌ এবং বিমানবাহিনী প্রশংসা করে জেনারেল বলেন যে, নৌ ও বিমানবাহিনীও আমাদের এই যুদ্ধে জয়ের বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তিনি বলেন, বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করার দরুন আমাদের সেনাবাহিনীর সাফল্যের দ্বার খুব তাড়াতাড়ি খুলে গিয়েছে। চট্টগ্রাম, চালনা এবং আরও কয়েকটি বন্দরে ভারতীয় নৌবাহিনীর সক্রিয় তৎপরতার দরুন পাকিস্তানি ফৌজ বিশেষ কিছু করতে পারেনি।

জেনারেল বলেন, প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। এগুলোর বেশির ভাগই হলো আমেরিকা, চীন ও ইরানের। কিছু ইতালিরও আছে।

এক ঘণ্টার বেশি জেনারেল রিপোর্টারদের নানান প্রশ্নের জবাব দেন। একজন বিদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসেছে বলে তিনি সংবাদপত্রে দেখেছেন। এ সম্পর্কে তিনি আর কিছুই বলতে পারেন না।

জেনারেল বলেন: পরশু আমি আবার ঢাকায় যাচ্ছি। সবকিছু ভালোভাবে দেখতে। গতকাল জনসমুদ্র ছাড়া আর কিছুই দেখা হয়নি। বৈঠক থেকে জেনারেল অরোরা যখন ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে তাঁর গাড়িতে উঠতে যাবেন তখন দেখি হাজার হাজার লোক 'জেনারেল অরোরা—জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিচ্ছেন। ভিড়ে ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ যখন ভিড় ঠেলছে, লাঠি দিয়ে, জেনারেল তখন বললেন, 'ডোন্ট পুশ দেম।'

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১